ইতিহাস কথা কও

সিরাজুদ্দীন হোসেন
প্রাক্তন বার্তা সম্পাদক
দৈনিক ইত্তেফাক



দীপায়ন : ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম সংস্করণ

আগস্ট, ১৯৭৪

২০ কেশব সেন স্ট্রীট । কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদপট । সন্দীপন ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর । দি প্যারট প্রেস

৭৬/২ বিধান সরণী । কলিকাতা ৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

মরহুম তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)
যিনি ছিলেন আমার রাজনৈতিক চিন্তাধারার
দিশারী ও দ্রষ্টা,
যিনি দেশ বিদেশের মানুষের
স্বার্থ ও কল্যাণের জন্য
জীবনধারণ ও জীবনদান করে গেছেন,
যাঁর কাছে বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন
আদায়ের বিষয়টি নিশ্চিত দায়িত্বরূপে গণ্য ছিল
এবং এই মূহুর্তে জাতি যাঁর তিরোধানকে
গভীরভাবে অনুভব করে—
তাঁরই প্রিয় স্মৃতির উদ্দেশ্যে
এই বই নিবেদিত ॥

সূচীপত্র

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বযুগ

ভূমিকা
উত্তরলেখ
পূর্বকথা
দর্পণে এক নজরে
হিন্দু মহাসভার পাকিস্তান ব্যবচ্ছেদ উদ্যোগ
আসামের ঘটনাপঞ্জী
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও দেশবিভাগ প্রশ্নে 'সোহ্‌রাওয়ার্দী'
যুক্ত বাংলার স্বপক্ষে সোহ্‌রাওয়ার্দী
সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপক্ষে ফজলুর রহমান
দেশবিভাগ প্রশ্নে মর্ণিং নিউজ
তারা সিংয়ের ১৯৪০-এর পরিকল্পনা
হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দাবী
লীলা রায়ের ঢাকা সফরের অভিজ্ঞতা
সোহ্‌রাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে বাংলা লীগ নেতৃবৃন্দের চক্রান্ত
সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন
মুসলমানরা কি চায়: মর্ণিং নিউজ
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখার জন্য সোহ্‌রাওয়ার্দীর আবেদন
ভারত বিভক্তি অত্যাসন্ন ব'লে 'ডেলী হেরাল্ডে'র অভিমত
বিহারের দ্বিধাবিভক্তি দাবী
জমিদারী দখল বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত
কলকাতায় দাঙ্গা পরিস্থিতির অবনতি
সোহ্‌রাওয়ার্দীর স্বাধীন বাংলা প্রস্তাব

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার স্বপক্ষে নাজিমুদ্দিন
মেকী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মর্ণিং নিউজ : লাহোর প্রস্তাবের উপর গুরুত্ব আরোপ
বিবেক বর্জিত অসৎ ব্যক্তি
অবিভক্ত সার্বভৌম বাংলার স্বপক্ষে আবুল হাশিমের আবেদন
জনাব জিন্নাহ্ কর্তৃক বঙ্গ-বিভাগ দাবীর নিন্দা
গালিগালাজ করে কি লাভ
লাহোর প্রস্তাবের প্রতি জনাব আকরম খাঁর সমর্থন অব্যাহত
ফরিদপুরে বাংলা লীগ কাউন্সিল বৈঠক
হিন্দু সাম্প্রদায়িক পত্র-পত্রিকার বিরুদ্ধে সোহ্‌রাওয়ার্দীর ব্যবস্থা গ্রহণ
লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বিভাগ প্রশ্ন আলোচনা
নিষ্পত্তি আলোচনা
মর্ণিং নিউজের আকস্মিক মত পরিবর্তন
গান্ধী এবং শরৎ বসুর সাথে আবুল হাশিমের সাক্ষাৎ
গান্ধীর সাথে সোহ্‌রাওয়ার্দীর আলোচনা
জনাব নূরুল আমীন কর্তৃক সাব-কমিটির কার্যাবলী ব্যাখ্যা
গান্ধীর সাথে সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাক্ষাৎ
দিল্লীতে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী
রাইফেল ক্লাব স্থাপনের জন্যে টেগুনের আহ্বান
বাংলা বিভাগ উদ্যোগ সম্পর্কে জনাব লিয়াকত আলী খান
জনাব মাহমুদ নূরুল হুদাও মুখ খুললেন
একটি যুক্তি
বেরারের পক্ষে মর্ণিং নিউজ
মর্ণিং নিউজ বলেন—'বিপদজনক উদ্যোগ"
হিন্দু-মুসলিম আলোচনা প্রসঙ্গে বাহার
জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব
আকরাম খাঁর অনধিকার প্রবেশ আশঙ্কা

একটি পৃথক মিশন
জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে
রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর জন্যে খালেকুজ্জামানের ওকালতি
চট্টগ্রামের প্রতিক্রিয়া
আকরাম খাঁ লাহোর প্রস্তাব ছাড়া আর কোন পরিকল্পনার কথা জানেন না
তাঁদের "মিশনের প্রতি পদক্ষেপ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে"
সমালোচকদের জবাবে জনাব আবুল হাশিম : "আমার দাবী লাহোর প্রস্তাবের সংগে সংগতিপূর্ণ
পঞ্চাশ : পঞ্চাশ
ফজলুর রহমান কর্তৃক হিন্দু-মুসলিম আলোচনার পূর্ণ চিত্র উন্মোচন
একটি পত্র
"সালার-এ সুবার শেষ রক্ত বিন্দু"
শ্রী মণ্ডলের আশঙ্কা প্রকাশ
হিন্দু-মুসলিম আলোচনা প্রসঙ্গে শরৎ বসু
মাউণ্টব্যাটেনের শর্ত
তাঁদের পরিচয় অজ্ঞাত
কায়েদে আজম কর্তৃক যোগাযোগের রাস্তা দাবী : সামরিক জোট গঠনে আগ্রহ প্রকাশ
কায়েদে আজমের দাবীর প্রতি সমালোচনা
একটি খবর ও তার প্রতিবাদ
আলী আহমদ খানের দৃষ্টিতে
গভর্ণর বারোর উদ্বেগ
প্রাদেশিক লীগ কর্তৃক বাংলার ভবিষ্যৎ কায়েদের হস্তে সমর্পণ
আদর্শে অটল শরৎ বসু
অখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক
"সার্বভৌম বাংলার" বিয়োগে মর্ণিং নিউজের শোক

বিভাগ প্রতিরোধ সম্মেলনে জনাব হাবিবুল্লাহ্ বাহারের ভাষণ
বৃটিশ সরকারের ৩রা জুন পরিকল্পনা ঘোষণা
লীগ কাউন্সিল বৈঠক অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত
মুসলিম বাংলার প্রতিক্রিয়া
ভারত বিভাগ পরিকল্পনায় বার্মার ক্ষোভ
জনাব ফিরোজ খান নুন
পরিকল্পনা গ্রহণে অখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সম্মতি
পরিস্থিতির আকস্মিক মোড় পরিবর্তন
অকাল প্রচারণা
বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য এম, এল, এ-দের বৈঠক আহ্বান
আবার আগাম প্রচারণা—এবারের লক্ষ্য দু'টি
৩রা জুন পরিকল্পনায় কংগ্রেসের সম্মতি
লীগ পার্লামেণ্টারী বোর্ডের বৈঠক
স্যার ওলাফ কর্তৃক একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন
পাকিস্তানের স্বপক্ষে ভোটদানের জন্য সিলেটবাসীর প্রতি আবেদন
বাংলা দ্বিধাবিভক্ত
"বাংলার পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত"
লীগের তিন কমিটি
মওলানা ভাসানীর মুক্তিলাভ
ডঃ ঘোষ কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা নির্বাচিত
পাঞ্জাব দ্বি-খণ্ডিত
লীগের সিদ্ধান্ত—ঢাকা হবে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী
সিলেট পূর্ব-পাকিস্তানে যোগদানের সিদ্ধান্ত
একটি নতুন জাতির জন্ম
একটি প্রেক্ষিত—সমীক্ষা : বিভাগোত্তর কাল

পরিশিষ্ট

ক। ১৯৪৭ সালের ২৭শে এপ্রিল দিল্লীতে প্রদত্ত মিঃ এইচ, এস, সোহ্‌রাওয়ার্দীর বিবৃতি

খ। অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হিন্দু মহাসভাপন্থী ও অন্যরা যে সমালোচনা করেন তার জবাবে প্রদত্ত জনাব সোহরাওয়ার্দীর বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ

গ। কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করলে জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দীর জনগণকে শান্তিরক্ষা করার জন্য যে ভাষণ দেন

ঘ। ১৯৪৭ সালের ২৯শে এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক জনাব আবুল হাশিমের বিবৃতি

ঙ। লাহোর প্রস্তাব। ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ বাংলার জনাব এ, কে, ফজলুল হক কর্ত্তৃক উত্থাপিত ও ২৪শে মার্চ গৃহীত

চ। দিল্লী প্রস্তাব। ১৯৪৬ সালের ৯ই এপ্রিল বাংলার জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দ্দী কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত

ছ। ১৯৪৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের ১২ দফা কর্মসূচী

জ। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে অনুষ্ঠিত গ্রাণ্ড ন্যাশনাল কনভেনশনে গৃহীত শাসনতন্ত্রের বিকল্প মূলনীতি প্রস্তাব

ঝ। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রণ্টের ২১ দফা কর্মসূচী

ঞ। আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী

ট। পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন (পি, ডি, এম) এর ৮-দফা কর্মসূচী

ঠ। পাকিস্তান গণতান্ত্রিক দলসমূহ সমবায় (পি, ডি, পি,) এর ১৯৬৯ সালের ঢাকায় অনুষ্ঠিত কনভেনশনে গৃহীত শাসনতান্ত্রিক কর্মসূচী।

ভূমিকা

তরুণ বন্ধু ও আমার সাংবাদিক জীবনের এককালীন সহকর্মী জনাব সিরাজুদ্দীন হোসেন যখন তাঁর নতুন লেখা বই 'Day's Decisive' এর ভূমিকা রচনার প্রথম প্রস্তাব নিয়ে আসেন আমার কাছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমার প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো : 'কে কাকে পরিচিত করার দায় নেবে, ভাই। সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়, বহুল-প্রচারিত দৈনিক পত্রিকার প্রখ্যাত নিউজ এডিটর হিসেবে আপনিই বরঞ্চ আমাকে লোকসমক্ষে তুলে ধরার দায়িত্ব নিতে পারেন। আর আমি কিনা —।' তিনি কিন্তু শুধুই হেসেছিলেন। তারপরই আমার অনিচ্ছা উপেক্ষা করে পাণ্ডুলিপি খুলে পড়া শুরু করেছিলেন। প্রথম পরিচ্ছেদটি শেষ হবার আগেই আমি তাঁকে কথা দিয়েছিলাম বইটির ভূমিকা লিখবো বলে। হেতু অবশ্য তাঁকে পরিচিত করা নয়। বইটির সঙ্গে নিজের নাম সংশ্লিষ্ট করে নিজেকেই সবার গোচরীভূত করা। অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে বইটিতে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে পাকিস্তানের ইতিহাস—আদি থেকে শেষ পর্যন্ত। পাকিস্তানের ইতিহাসে এটি একটি মূল্যবান সংযোজন। ক্ষুদ্র হলেও এটি একটি মহৎ গ্রন্থ। যেন অনেকগুলি খণ্ডের সংক্ষিপ্তসার। পাকিস্তান অর্জনকল্পে মুসলিম বেঙ্গল যে ভয়াবহ ত্যাগ স্বীকার করেছে ও অসামান্য অবদান রেখেছে এবং পরিবর্তে তাকে যে নিগ্রহ ভোগ করতে হয়—সে বিষয়ে সকল কথাই অতি সংক্ষেপে বলা হয়েছে এই বইটিতে। ঘটনা ও তথ্য প্রমাণাদির উপস্থাপনা ও তার বিশ্লেষণ নির্ভুল ও বাস্তবাশ্রয়ী। কিন্তু এরই সঙ্গে জড়িয়ে আছে লেখকের স্বদেশপ্রেমী হৃদয়ের উৎকল্পনা। তাঁর বিক্ষুব্ধ আত্মাও যেন সেখানে লক্ষকোটি লাঞ্ছিত মানুষের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত। ফজলুল হক, সোহ্‌রাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম—বাংলার এই তিন অম্লান ব্যক্তিত্বকে যথাযথ চিত্রিত করেছেন লেখক ; মুখোশ খুলে দেখিয়েছেন, স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে এঁদের অবদান আগাগোড়া তুলনাহীন হলেও, কেমন করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কুচক্রী রাজনৈতিক ক্ষমতাভোগীদের দ্বারা এঁরা নিগৃহীত ও অপমানিত হয়েছেন। এক গোপন উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে এ কাজ তাঁরা করেছিলেন ঐতিহাসিক তথ্যপঞ্জী ও দলিল-পত্রের বিকৃতি ঘটিয়ে।

বিশেষ করে সার্বভৌম ও স্বাধীন মর্যাদাসহ বঙ্গ-বিভাগ অপনোদনে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের দূরদর্শিতামূলক নিষ্ফল প্রচেষ্টা ও তাকে ঘিরে কায়েদের মৃত্যুর পরবর্তীকালে পাকিস্তানের মসনদে সমাসীন বাঙ্গালী বিরোধীচক্রের তৎপরতায় গড়ে তোলা দুরভিসন্ধি ও অসৎউদ্দেশ্য-মূলক, বানোয়াট কাহিনী সংক্রান্ত পর্যায়টি বিস্তারিত প্রামাণিক উদ্ধৃতিসহ চিত্রিত করার অংশটি খুবই আকর্ষণীয়। পাকিস্তান আন্দোলনের এই দুই নায়ককে তীর্যকভাবে পাকিস্তানের শত্রু হিসেবে রূপায়িত করা হয়েছে; যদিও দেখানো হয়েছে তাঁরা সর্বদাই কায়েদে আযম ও মুসলিম লীগের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করে চলেছেন। সমসাময়িক কাগজপত্র থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক সিরাজুদ্দীন হোসেন কুচক্রীদের বাকরুদ্ধ করে দিয়েছেন।

বইটির শেষে সংযোজিত পরিশিষ্টটি বিশেষরূপে মূল্যবান। পাকিস্তানের রাজনীতি বিষয়ে যারা বই লিখবেন কিংবা আলোচনা করবেন তাঁদের পক্ষে এটি উৎসানুসন্ধানে সহায়ক হবে।

এই কারণে, অত্যন্ত আনন্দের সাথেই ভূমিকা লেখক ও প্রথম পাঠক হিসেবে বইটির সঙ্গে নিজের নাম সংযুক্ত করছি।

—আবুল মনসুর আহমদ

৫৪৩, এল,
ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা,
ঢাকা—৫।

১৮-১০-৭০

উত্তরলেখ

উপরোক্ত ভূমিকাটি প্রায় চার বছর আগের লেখা। এই বইয়ের লেখক আমার বন্ধু সিরাজুদ্দীন হোসেন তখন জীবিত ছিলেন। আজ আর তিনি নেই। আমরা ঠিক জানি না তিনি এখন মৃত না নিরুদ্দিষ্ট। রাজনৈতিক কিংবা ধর্মতাত্ত্বিক যা-ই হোক না কেন, স্বাধীনতার ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যে সব প্রখ্যাত ব্যক্তির মৃতদেহ কেউই উদ্ধার করতে পারেন নি, যুদ্ধের সময় তাঁরা শত্রু কর্তৃক নিহত হয়েছেন বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। এই সব মানুষেরা হয়ে উঠেছেন রূপকথার নায়ক। জনগণের একান্ত বিশ্বাস তাঁরা অদ্যাবধি বেঁচে আছেন। যে কোনদিন তাঁরা আবার মহা-সমারোহে মহত্তর কর্মতৎপরতা নিয়ে আবির্ভূত হবেন। সিরাজুদ্দীন বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী বলেই, তিনি তেমনি এক রূপকথার নায়ক হতে পেরেছেন।

আরও এক কারণে সিরাজুদ্দীন অমর হয়েছেন। আল্ কোরআনে বলা হয়েছে ঃ'সত্যের জন্য যাঁরা জীবনাহুতি দিয়েছেন তাঁদের মৃত মনে করো না।" সিরাজুদ্দীনের ক্ষেত্রেও এ উক্তি প্রযোজ্য। দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে অমরত্ব বলতে যা বোঝান হয়ে থাকে—এ অমরত্ব সে অমরত্ব নয়। এ অমরত্ব হচ্ছে আত্ম-ত্যাগীর—একজন শহীদের।

অন্য এক কারণেও সিরাজুদ্দীন অমরত্বের দাবীদার। প্রখ্যাত সাংবাদিক হিসেবে তাঁর অজস্র রচনার মধ্যে তিনি রেখে গেছেন একটি ছোট্ট অথচ বিখ্যাত বই। আমাদের রাজনৈতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ এই বইটির ভূমিকা লিখতে পেরে আমি গৌরবান্বিত। বইটি প্রকাশ করেছিলেন সোসাইটি ফর পাকিস্তান ষ্টাডিজ। এই প্রতিষ্ঠানটি আজ আর নেই। আমার আশংকা ছিলো, এ বইটি বোধ হয় আর প্রকাশিত হবে না। সে ক্ষেত্রে জাতির পক্ষে যেমন, তেমনি সিরাজুদ্দীনের উত্তরাধিকারী ও সন্তানসন্ততিদেরও অপূরণীয় ক্ষতি হোত।

আমার আশংকা অমূলক প্রতিপন্ন হওয়ায় আমি আনন্দিত। ভিন্ন নামে বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন খোশরোজ কিতাব মহলের স্বত্বাধিকারী জনাব মহীউদ্দীন আহমদ। "Day's Decisive" নামটি বদলে

বইটির নতুন নামকরণ করা হয়েছে "Look into the Mirror" ব্যবসায়িক দিকটি ছেড়ে দিলেও জনাব মহীউদ্দীন আহমদ যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, তা প্রশংসনীয়। বিশেষভাবে সিরাজুদ্দীনের উত্তরাধিকারী ও সমগ্রভাবে জাতির কাছে এটি একটি স্মরণীয় উপহারস্বরূপ। লেখকের উত্তরাধিকারীদের বর্তমান দুর্দিনে বইটি অর্থনৈতিক দিক থেকে সাহায্য করবে। আর সেই সংগে রাজনৈতিক রচনাবলীর চূড়ান্ত প্রয়োজনের লগ্নে জাতি পাবে এক বুদ্ধিদীপ্ত অবদান।

আমার বিবেচনায়, বইটির নাম পরিবর্তন অযথার্থ নয়। বরঞ্চ আমার এটি ভালোই লেগেছে। বছর চারেক আগে আসলেই বইটির প্রতিপাদ্য ছিলো, আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক জীবনের এক চূড়ান্ত পর্যায়ের নিখুঁত উপস্থাপনা। কিন্তু বর্তমানে, পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এটি হয়েছে এমন এক আয়না যার মধ্যে প্রতিফলিত আমাদের রাজনৈতিক জীবনের এক পর্যায়ের শোকাবহ চিত্র। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর সাথে জড়িত প্রতিটি মানুষই এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন।

নামকরণে রদবদল ঘটলেও, বইটির সঙ্গে আমার নাম যুক্ত করতে পেরে আমি গৌরবান্বিত।

—আবুল মনসুর আহমদ

১৯শে জুন, ১৯৭৪।

পূর্ব-কথা

ধন-জন ও অর্থ-সম্পদে বিপুল ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে পাকিস্তান অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু কোন্ আদর্শ ও মূল্যবোধ ভারতীয় উপমহাদেশের প্রদেশগুলিতে ছড়িয়ে থাকা মুসলমানদের এই চরম ত্যাগ স্বীকারে প্রেরণা যুগিয়েছিল? আমাদের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য জনসাধারণের মধ্যে যে নিরঙ্কুশ ঐক্যবোধের প্রয়োজন ছিল, তা গড়ে উঠেছিল কোন্ সাধারণ তাগিদ ও উচ্চাকাংখা, কোন্ আশা ও বিশ্বাসের উৎস থেকে? পাকিস্তান অর্জিত হলে পাঞ্জাবী, পাঠান, বেলুচী, বাঙ্গালী ও সিন্ধীদের জন্য সমান কল্যাণকর হবে কিনা, সে সম্পর্কে আমাদের জনসাধারণের মনে কোন প্রকার কুৎসিত সন্দেহ বা কটু প্রশ্নের উদ্রেক, মুসলমানের মুক্তিসংগ্রাম চলাকালে হোল না-ই বা কেমন করে? সংগ্রামের সময় যে বিপুল ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, সর্বত্র তার পরিমাণ সমান ছিলো না, এমনকি পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি বাংলাদেশের আত্ম-নিবেদন যতটা আন্তরিক ও ঐকান্তিক ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশগুলির ততটা ছিল না। সম্ভবতঃ সেই কারণেই যে অঞ্চলে শতকরা সাতানব্বই জন মুসলমানের বাস, সে অঞ্চলের মানুষ পাকিস্তানের পক্ষে শতকরা মাত্র ৫০.৮ ভাগ ভোটের জোরে পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিলো। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশে যেখানে শতকরা চুয়ান্নজন মুসলমানের বাস, সেখানে মানুষ শতকরা ৯৮% ভোট দিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলো। এগুলি প্রামাণিক তথ্য। এ সব তথ্য নিরপেক্ষতা, বিশ্বস্ততা ও সততার সঙ্গে লিপিবদ্ধ হওয়ার দাবী রাখে। তা যদি হয়, তাহলে আজ বাঙ্গালীদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলা হয় কেন? তাহলে কেনই বা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে আজ এই পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ বিদ্যমান? দেশের উভয় অংশের সাধারণ মানুষের মধ্যে বর্তমানের এই সৌহার্দ্যহীনতা বিরাগতা ও নৈরাশ্যময়তার কারণই বা কি? আজকের দিনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আমরা যে সখাত সলিলে নিমজ্জিত, সেই খাত সৃষ্টির জন্য দায়ী কারণগুলিই বা কি? আমি আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় এই সব বিষয় ও প্রশ্নাবলী উত্থাপন ও তার প্রামাণিক জবাব দানে প্রয়াসী হয়েছি। আমার এ বইখানি তারই ফলশ্রুতি এবং নিঃসন্দেহে তারই সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা এর মধ্যে প্রকটিত। যে আন্দোলন ও সংগ্রাম

পাকিস্তান সৃষ্টিকে বাস্তবায়িত করেছিলো এবং বিগত তেইশ বছরে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে যে সব ঘটনা ও বিক্ষোভ আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে এ বইতে সংক্ষেপে সে সবই বিশ্লেষিত হয়েছে। এ কাজ নিঃসন্দেহে দুরূহ ও জটিল।

উপমহাদেশের মুসলমানগণ যে আদর্শের জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছিলো, তাদের কাছে সে আজ স্বপ্নই রয়ে গেছে। তাদের উদ্দেশ্য বিভ্রান্ত হয়েছে—তাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে। তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছে দুঃখ,দারিদ্র ও নির্যাতনের গভীর খাতে। সম্পদ মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দের পরম শত্রু এবং সম্পদের নেশা মানুষের বহু সদগুণের বিনাশ সাধন করে এবং বহু মানবিক চিন্তাধারার বিকাশ সাধনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, তারই ফলে দেশের আইন ও শৃংখলা পরিস্থিতি হুমকির সম্মুখীন হয়। দুর্নীতি চরম সীমায় গিয়ে পেঁাছোয়, মানবিক মূল্যবোধ নিঃশেষিত-প্রায় হয়ে ওঠে, রাজনৈতিক অসন্তোষ সব কিছু ছাড়িয়ে ব্যাপক আকার ধারণ করে। আজকের দিনের চেহারাই এই। বিশৃংখলা ও ভুলবোঝাবুঝি আজ চরম সীমায় উপনীত। পরিণতিতে জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তিমূল আজ বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। বিগত বছরগুলিতে জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে মতবিনিময় সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে ওঠে। স্বঘোষিত নেতৃবৃন্দ জনগণ ও সরকারের মধ্যে কোন সেতুবন্ধ সৃষ্টি করতে পারেন নি। পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠদের দাবীদার হলেও তার ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমন একটি মনোভাব এখানকার জনসাধারণের মধ্যে তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রাপ্যহারে না হলেও সমান প্রতিনিধিত্বের সোচ্চার দাবী সুদূর পরাহত। লাহোর প্রস্তাবে যে আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের রূপরেখা ছিলো—তা আজও কার্যকরী হতে পারেনি। অথচ লাহোর প্রস্তাবই আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার ভিত্তিমূল। এরই ফলে সমগ্র জাতি আজ ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন। কিন্তু কেন? জনসাধারণের রায়ের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন এবং বিভাগ-পূর্ব আমলে প্রদত্ত আমাদের নেতাদের প্রতি-শ্রুতির প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন এবং বিভাগ পরবর্তীকালে জনসাধারণকে সাধারণ নির্বাচনের সুযোগ গ্রহণে বঞ্চিত করাই আমাদের জাতীয় জীবনে সৃষ্ট সকল নিগ্রহ ও অন্যায়ের মূল কারণ। আজ যখন জাতি তার ইতিহাসের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, তখনও আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, আমাদের জাতীয় জীবনের সমস্যাবলীর বাস্তব

সমাধানের পথকে অবরুদ্ধ করার অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সেই পুরনো খেলাই খেলা হচ্ছে। যে সময় জাতির সাহায্যে সমস্ত সৎ লোকের এগিয়ে আসা উচিত, সেই সময় গভীর দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এতকাল যে সব সমস্যার সমাধান হয়নি এবং যে সব সমস্যা জাতির প্রাণশক্তিকে ক্ষয় করেছে সেই সব মূল বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। বাংলার মানুষের নিয়তির কি পরিহাস, কেবল মাত্র পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারাই নয়, একদা যারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল তারাও আজ এতদঞ্চলের জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দকে বিভেদসৃষ্টিকারী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে অভিযুক্ত করতে পুনরায় তৎপর হয়ে উঠেছেন। সেই পুরাতন খেলা। লাহোর ও দিল্লী প্রস্তাব উত্থাপনকারী জনাব এ, কে, ফজলুল হক ও এইচ, এস, সোহ্‌রাওয়ার্দীর মতো বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পূর্বাঞ্চলীয় নেতৃবৃন্দও এই চক্রান্ত থেকে বাদ পড়েন নি। পূর্ব-পাকিস্তানের আরও বহু নেতার মতো এই দুই নেতাকেও বিশ্বাসঘাতকরূপে চিহ্নিত হওয়ার দুর্ভাগ্য বরণ করতে হয়েছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের তথাকথিত "জাতির ত্রাণকর্তাদের" উদ্দেশ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের যে কোন মানুষ ন্যায়সঙ্গতভাবেই বলতে পারেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানী মোড়লদের জন্য নয় বরং পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের বদৌলতেই দেশের এই অঞ্চলের মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং পাকিস্তান অর্জনে সর্বাধিক সাহায্য করেছিল। ব্যাপারটা যখন এই রকম, তখন পাকিস্তানের আদর্শ সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানী মোড়লেরা যেসব যুক্তি ও উপদেশ বর্ষণ করে থাকেন, তা' এ অঞ্চলের মানুষকে বিন্দুমাত্র খুশী করতে পারে না কারণ, এ অঞ্চলের মানুষের নিশ্চিতরূপে এমন কিছু বলার আছে যা হয়তো ওই সব মোড়লদের জানার অগোচর। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের সমন্বয়ে গঠিত দেশের এই অংশের অগণিত সংগ্রামী মানুষের স্বার্থের প্রতি পৌণঃপুণিক স্বেচ্ছা-প্রণোদিত বিশ্বাসঘাতকতার আবর্জনার স্তূপে সমাহিত, আমাদের জাতীয় জীবনের এইসব বিস্মৃত অধ্যায়গুলির সঙ্গে পাঠক সাধারণের পরিচয় সাধনের বিনীত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি আমার এই বই, "Day's Decisive।" আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাবিদগণ, বিশেষ করে, আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানের ভ্রাতৃবৃন্দ এখন বিচার করে দেখুন, বিগত বছরগুলোয় এতদ্‌ঞ্চলের জনসাধারণ যে আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করে আসছেন, তা কি তাদের বেশী চাওয়া, নাকি সে তাদের অধিকার আদায়ের

চেয়ে বেশী কিছু অথবা আমাদের নেতৃবৃন্দ ও পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের বিরুদ্ধে যে সব মনগড়া অভিযোগ করা হয় সেগুলি কি যুক্তিযুক্ত—বিশেষ করে লাহোর প্রস্তাবকে আজও যখন সরকারীভাবে পাকিস্তান প্রস্তাব বলে স্বীকার করা হয়, আজও যখন তেইশে মার্চকে সরকারীভাবে ঘরে ও বাইরে পালন করা হয় এবং লাহোর শহরকে যখন পাকিস্তান মনুমেণ্ট বক্ষে ধারণ করার মর্যাদায় মণ্ডিত করা হয়েছে, তখন।

আমার এই গ্রন্থ রচনার দায়িত্বভার গ্রহণের প্রধান লক্ষ্য আমাদের সাধারণ মানুষের মনোভাবকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরা, কারণ আমি গভীর-ভাবে বিশ্বাস করি যে, অতীতে সাংবিধানিক উপায়ে অথবা অন্যভাবে যে সব সরকার ও শাসনব্যবস্থা ক্ষমতায় এসেছে তারা এই সব সাধারণ মানুষের স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে গেছে। এইসব সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ এবং তাদের উন্নততর ভবিষ্যতের কল্পনার প্রতি আমার সমর্থন যতটা সফলতার সঙ্গে আমি প্রকাশ করতে পেরেছি—এ বই ততটাই সফলতা ও সার্থকতা লাভ করতে পেরেছে।

"A Look into the Mirror" শীর্ষক পরিচ্ছেদে আমি যে সব প্রামাণিক উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছি সেগুলি দেশের তৎকালীন মুসলিম লীগ দৈনিকগুলি থেকে গৃহীত হয়েছে—অন্য কোন সূত্র থেকে নয়। এগুলির সত্যতা ও উপযুক্ততা সম্পর্কিত প্রশ্ন এড়ানোর জন্যই আমাকে তা করতে হয়েছে। "Retrospect : Post-Partition" শীর্ষক পরিচ্ছেদে যে সব উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেগুলি দেশের উভয় অংশের জাতীয় দৈনিকগুলি থেকে সংগৃহীত।

বইটিতে সর্বাংশে সত্য ঘটনা এবং সত্য পরিস্থিতি উপস্থাপনের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করে গেছি। সাধারণ মানুষের স্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কোন ব্যক্তির পক্ষে যতটা করা সম্ভব—এ ব্যাপারে তা করতে আমি ত্রুটি করিনি। বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতির পরিবেশনা এবং সেগুলি সম্পর্কে আমার সমীক্ষা ও সিদ্ধান্তাবলী হয়তো সমভাবে সর্বজনগ্রাহ্য হবে না কিন্তু সেগুলি যদি আমাদের জনসাধারণকে পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা দূরায়ত দৃষ্টিপাত এবং তাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য সত্য অনুধাবনে উদ্বুদ্ধ করে, তাহলেই আমার পরিশ্রম স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

আসুন, আমরা গিলবার্ট হল্যাণ্ডের ভাষায় প্রার্থনা করি ঃ

"প্রভু আমাদের মানুষ দাও।
এ সময় দাবী করে
শক্তিশালী মন, মহান হৃদয়
সত্যিকার বিশ্বাস এবং প্রকৃত হাত—
সেই সব মানুষ দাও যাদের
হত্যা করতে পারে না গভীর লোভ,
সেই সব মানুষ দাও যাদের
কিনতে পারে না ক্ষমতার আবর্জনা ;
সেই সব মানুষ দাও যাদের
সম্মানবোধ আছে ;
সেই সব মানুষ দাও যারা
মিথ্যা বলবে না ;
- - - - ন্যায়বিচার দেশকে শাসন করুক
এবং সৎসাহস আমাদের প্রয়োজন
পূরণ করুক ॥"

—সিরাজুদ্দীন হোসেন

৫, চামেলী বাগ
ঢাকা।

১-৭-৭০

আজ থেকে ২৪ বছর আগের কথা।

১৯৪৬ সনের কোন এক সন্ধ্যায় কোলকাতার হ্যারিংটন ষ্ট্রীটে জনাব ইস্পাহানীর বাসভবনের সবুজ-ঘেরা উদ্যানে বসে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কর্মীদের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। এক পর্যায়ে আলাপের সূত্র ধরে কোন এক কর্মী তাঁকে প্রশ্ন করলেন জনাব, ওরা যে বলে, পাকিস্তান হবে ধনীদের দেশ, গরীবদের সেখানে কোন পাত্তা থাকবেনা— কথাটা কি ঠিক?

দূর আকাশের দিকে নজরটা বিছিয়ে দিয়ে কায়েদে আজম সেদিন বলেছিলেন: 'আজ থেকে ৯ বছর আগে, ১৯৩৭ সালে আমি একবার বাংলায় আসি। সেবার বাংলার গ্রামাঞ্চল ঘুরে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেই সুযোগে গ্রাম-বাংলার মুসলমানদের চেহারায়-ছুরতে দেখেছিলাম কেবল নিদারুণ দারিদ্রের ছাপ। দেখে-ছিলাম, হিন্দু জমিদারদের শোষণ ও নিষ্পেষণের যাঁতাকলে দলিত মথিত হয়ে জীবন সংগ্রামের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে তারা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খোদার দেয়া জমিনে তারা ফলিয়েছে সোনালী আঁশ আর মাড়োয়ারী ও ইংরেজ বেনিয়ারা তা পানির দামে খরিদ করে চালান দিচ্ছে কোলকাতায়; আর সেই পাটের বিনিময়েই নিজে-দের জন্য গড়ে তুলেছে তারা মুনাফার পাহাড়। অথচ, যে মুসলমানরা বছরের পর বছর সে সোনার ফসল ফলিয়ে আসছে, শরীরে তাদের দেখিনি এক টুকরো বস্ত্রের লেশ। সন্তান-সন্ততির মুখে জোটেনি দু'মুঠো অন্ন। অনাহারে-অনশনে জীর্ণ-শীর্ণ, রোগ-পাণ্ডুর মলিন চেহারায় তাদের ছিলনা কোন জীবনের স্বাক্ষর। সেদিন আমার সেই গরীব ভাইদের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রাণটা আমার ডুকরে কেঁদে উঠেছে। সেই থেকে কেবলই ভেবেছি, আর ভেবে ভেবেই

হয়রান হয়েছি যে, কি করে তাদের এ চেহারা বদলিয়ে মুখে তাদের হাসি ফুটান যায়। মনে মনে শেষে আমি এই সিদ্ধান্তেই এসেছি যে, এই এলাকার রাজনৈতিক ক্ষমতা যদি আমরা হাতে নিতে না পারি, তা হলে কিছুই আর করা সম্ভব নয়। ---বৃটিশরা যদি ভারত ছেড়ে চলে যায়, আর এই এলাকা যদি পাকিস্তান না হয় তা হলে হিন্দুরা কোন ক্রমেই আমাদের এমন কোন আইন তৈরী করতে দেবেনা; যার বলে নিষ্ঠুর জমিদার-কুলের হাত থেকে মুসলমানদের আমরা মুক্ত করতে পারব। অতএব, পাকিস্তান আমাদের চাই-ই চাই।'

এই ছিলো জাতির পিতা কায়েদে আজমের দৃষ্টিতে পাকিস্তানে বাংলার কল্যাণ ভবিষ্যতের দিক্-নির্দেশ। কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর সে স্বপ্ন সফল হয়েছিল, আর মুসলমানদের নবার্জিত আবাসভূমি পাকিস্তানের মানচিত্রে আপন শ্যামলিমার স্বাক্ষরে উদ্ভাসিত হয়ে স্থান পেল খণ্ডিত বাংলার মুসলিম অধ্যুষিত বৃহত্তর অংশ—পূর্ববাংলা। লাহোর প্রস্তাবের আবেদন ও কায়েদে আজমের প্রতিশ্রুতির নির্ঘোষ তখনো অনাগত দিনের স্বপ্নসাধের সুরধ্বনির মতো অনুরণিত হচ্ছিল বাংলার অযুত সংগ্রামী মানুষের শ্রুতিপটে।

ভূ-ভারতের এই অঞ্চলে এ-সবই ঘটেছিল আজ থেকে ২৩ বছর আগে। কিন্তু কায়েদ যদি আজ বেঁচে থাকতেন এবং আর একবার পাকিস্তানের এই অংশ সফরে আসার সুযোগ যদি তাঁর হতো তা হলে সত্তুর দশকের বাংলার অবস্থা দেখে তিনি কি ধারণা নিয়ে যেতেন, তা নিতান্তই অনুমান সাপেক্ষ। গত দুই যুগের অধিককাল ধরে শাসনতান্ত্রিক সমস্যাবলী নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে দুই-দুইটি সংবিধান প্রণয়ন ও সংহারের প্রহসনও অনুষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু জাতি ১৯৪৭ সালে যেই তিমিরে ছিল আজো সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। আমাদের জাতীয় সমস্যাবলী সমাধানে

আর সব বিকল্প ব্যর্থ হয়েছে বলেই আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা স্বায়ত্বশাসন দাবীর আওয়াজে আজো পূর্ব বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত। শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত নানা কণ্টকাকুল সমস্যাজড়িত বিতর্কে সারাটি জাতি আজ দিশেহারা। অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছি আমরা। এখন প্রশ্ন হল আমাদের জাতীয় জীবনের এই সঙ্কট, এই অচলাবস্থার কারণ কি ?

এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আমি অখিল বঙ্গ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এক কালের সাধারণ-সম্পাদক জনাব আবুল হাশিমের জবানীতেই আমার পাঠকদের বলতে চাই: "সময় এসেছে যখন সত্য যা, তা বলতেই হবে। সস্তা জনপ্রিয়তা ও সুযোগসন্ধানী নেতৃত্বের মোহে নীচাশয়তার কাছে আত্মসমর্পণ—চিন্তার ক্ষেত্রে পতিতাবৃত্তিরই সামিল। সত্যিকার বিপ্লবের পথ অন্তর্ঘাতী দ্বন্দ্বে নয়, বরং চিন্তা ও অনুভূতির রাজ্যে বিপ্লব আনয়নে।

----বস্তুনিষ্ঠ চিন্তার ক্ষেত্রে ভাবপ্রবণতার কোন স্থান নেই। চিন্তা রাজ্যের ক্ষণিকের বিকৃতি যেন আমাদের ভবিষ্যতের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত না করতে পারে।"

বস্তুতঃ এই সত্যোপলব্ধির অভাবই আমাদের সমাজের অতীত ও বর্তমানের সকল দুর্গতির আদি কারণ।

ইতিহাস কখনো মিথ্যা বলে না। অতীতের নির্ভুল প্রতিকৃতি দর্শনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য দর্পণ হল ইতিহাস। তাই পুরনো দিনের কোন বিস্মৃত ঘটনা নিয়ে বিতর্কের উদ্ভব হলে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই তার স্বরূপ নির্ধারণের জন্যে শরণ নেন এই দর্পনের। আমাদের শাসনতান্ত্রিক সমস্যাবলীর সমাধান করে দুই অঞ্চলের মধ্যে গভীরতর সৌহার্দ-সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন এবং জনগণের মধ্যে দৃঢ়তর সংহতি বিধানের সকল প্রয়াস এ যাবৎ ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে আজ দেশের কল্যাণব্রতী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য হচ্ছে সাহসিকতার

সংগে ইতিহাসের দর্পণে অতীতের আসল চেহারা দেখে বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগের অন্যায় অনাচার সম্পর্কে সাফাই যা-ই দেয়া হোক না কেন, পূর্ব-পাকিস্তানের সদা জাগ্রত জনগণ ও সচেতন মুক্তিসৈনিকেরা গোড়াতেই কিছু আঁচ করতে পেরেছিলেন—ভাগ্যে তাঁদের বিড়ম্বনা আছে; কারণ যে লাহোর প্রস্তাবে সারা জাতি ছিল অঙ্গীকারাবদ্ধ, বিভাগোত্তর দিনগুলিতে সতর্কতার সংগে তাকে যে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এটা তাঁদের নজরে পড়তে দেরী হয়নি। ঠিক সে কারণেই তখন থেকেই তাঁরা সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন বাংলার স্বায়ত্তশাসন দাবীতে। ১৯৪৮ সালে পূর্ব-বাংলা মুসলিম ছাত্রলীগ ও ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের সংগ্রামের সূচনা বস্তুত এই দাবী নিয়েই। এই দাবী আদায়ের জন্যই বাঙালীরা ইস্পাত-কঠিন সংকল্প ঘোষণা করেছিল ১৯৫০ সালে গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল কন্‌ভেনশনে ইতিহাস রচনা করেছিল ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রাদেশিক পরিষদেও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল সর্বসম্মতিক্রমে, পার্লামেণ্টেও তাঁরা অক্লান্তভাবে লড়েছিলেন এই দাবী আদায়ের জন্যই। তবু তাঁদের সেই সাধের সোনার হরিণ মরীচিকার মতোই দূরে, বহুদূরে রয়ে গেছে আজও।

দেশের ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে বাঙালী মাত্রই বলবেন যে, ১৯৪০ সালের ইতিহাসবিশ্রুত লাহোর প্রস্তাবে ওয়াদা-কৃত স্বায়ত্ত-শাসন ছাড়া পূর্ব-পাকিস্তানের চলতে পারে না। বস্তুত পাক-ভারত উপমহাদেশের দশ কোটি মুসলমান এই প্রস্তাবের উপরেই তাঁদের সুস্পষ্ট রায় দিয়েছিল ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে।

আমাদের আজাদী সংগ্রামের অগ্রসেনানীদের অধিকাংশই এক এক করে বিদায় নিয়েছেন আমাদের মধ্য থেকে। তাঁদের অবর্তমানে

এদেশের কিছু সংখ্যক রাজনীতিক বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির কারণে অতীতের মতো বর্তমানেও সবকিছুরই একটা মনগড়া ব্যাখ্যাদানে উঠে পড়ে লেগেছেন। কিন্তু ইতিহাসের কোন সাচচা ও অনুরাগী পাঠকই তাঁদের এই মনগড়া ব্যাখ্যা কোনক্রমেই মেনে নিতে পারেন না।

প্রিয় মাতৃভূমির অতীত ইতিহাসের পটভূমিতে সব কিছুর বিচার-বিবেচনা করে দেশজোড়া সমস্যার সঠিক মূল্যায়নের ভিত্তিতেই তাঁরা চাইবেন একটা সিদ্ধান্তে পৌছুতে।

স্বায়ত্তশাসন দাবীর প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে যত কুৎসাই রটনা করা হোক, কিংবা তাঁদেরকে যত কালো রঙেই চিত্রিত করা হোক না কেন, ইতিহাসের কোন ধোপেই তা টিকবে না। স্বায়ত্তশাসন কিংবা লাহোর প্রস্তাবের স্বপক্ষেই হোক বা বিপক্ষেই হোক স্বকপোলকল্পিত কোন অবান্তর যুক্তির জাল বিস্তারে কোন লাভ নেই। ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে এ প্রশ্নের বাস্তব মূল্যায়নেই কেবল সমস্যা সমাধানের পথ পাওয়া যেতে পারে। ভুললে চলবেনা যে, লাহোর প্রস্তাবটি কোন দলবিশেষের নির্বাচনী ইস্তেহার মাত্র ছিল না, বরং মুসলিম লীগ নামের একটি রাজনৈতিক প্লাটফর্ম থেকে পরিচালিত একটি আন্দোলনের এটিই ছিলো মূল ভিত্তি।

দেশজোড়া গণভোট গ্রহণ করে সে প্রস্তাবটির পক্ষে সমগ্র পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের যে অনুমোদন লাভ করা হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে তা-ই ছিল ভারতীয় মুসলমানদের ভবিষ্যতের নিজস্ব আবাস-ভূমির রূপ-কাঠামো সংক্রান্ত সুস্পষ্ট রায়।

পাকিস্তানে গত ২৩ বছরে জনগণের উপর যে সংবিধানগত কাঠামো চাপিয়ে দেয়া হয়েছে লাহোর প্রস্তাব কিংবা স্বাধীনতার প্রাক্কালে জনগণের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের সঙ্গে তার অণুমাত্র সামঞ্জস্য নেই। জনগণের প্রদত্ত ম্যাণ্ডেট উপেক্ষা করতে মুহূর্তেকের

জন্যও বিবেকের দংশন অনুভব না করে আমাদের পার্লামেণ্টারিয়ানরাই দেশের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন স্বকপোলকল্পিত এক অভিনব রাষ্ট্র-কাঠামো। সে রাষ্ট্র কাঠামোর পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে আজকাল তাঁদের অনেকেই বলে চলেছেন, যেহেতু লাহোর প্রস্তাবটি ১৯৪৬ সালে সংশোধন করা হয়েছিল, কাজেই দেশের শাসনতান্ত্রিক ভবিষ্যত নির্ধারণ সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনায় লাহোর প্রস্তাবের কথা তোলা চলে না। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁরা উপযুক্ত তথাকথিত সংশোধনসম্বলিত দিল্লী প্রস্তাবটি তলিয়ে দেখার কষ্ট স্বীকার করতে একেবারেই পরাঙ্মুখ, কারণ তাঁরা জানেন যে, তাতে তাঁদের যুক্তির অসারতাই নগ্নরূপে প্রমাণিত হয়ে যাবে। প্রস্তাব দু'টির তুলনামূলক পাঠে দেখা যাবে যে, দিল্লী প্রস্তাবটি আদৌ লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনীরূপে গৃহীত হয়নি, বরং এটি ছিলো সম্পূর্ণরূপেই একটি নতুন ও স্বতন্ত্র প্রকৃতির দলিল ; যাতে আমাদের ঈপ্সিত আবাস ভূমির শাসনতান্ত্রিক কাঠামো-সংক্রান্ত কোন বিধানের উল্লেখমাত্র নেই।

লাহোর প্রস্তাবটি ১৯৪৬ সালে সংশোধন করা হয়েছিল—এই যুক্তির মধ্যে কতগুলি অভিনব জটিল সমস্যা সৃষ্টির দুরভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। প্রথমতঃ, লাহোর প্রস্তাবটি অখিল-ভারত মুসলিম লীগের সম্পত্তি। লীগ এই প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমেই গ্রহণ করে এবং এটিকে লীগের আদর্শগত বিশ্বাসের অঙ্গ (ক্রীড়্) হিসাবে তার গঠনতন্ত্রে স্থান দেয়। দ্বিতীয়তঃ, অখিল-ভারত মুসলিম লীগের বিশ্বাসের অঙ্গকে বিকল করার কোন এখতিয়ার দিল্লীর লেজিসলেটার্স কনভেনশনের ছিলো না। পরবর্তীকালে অখিল-ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিল দিল্লী প্রস্তাবটি অনুমোদন করেছিল বলে যে দাবী করা হয়, সেটিও নির্জলা মিথ্যা। লীগ কাউন্সিল যদি সত্যি প্রস্তাবটি অনুমোদনও করত, তবু তাতে করে লাহোর প্রস্তাবটি সংশোধিত হয়ে যেতো না। বরং খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, ১৯৪৬ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত লেজিসলেটার্স কনভেনশনে জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক উত্থাপিত আলোচ্য প্রস্তাবটি গৃহীত হয়

মুসলমানদের জন্য প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র আবাসভূমির জন্য একটি নিজস্ব সংবিধান প্রণয়নের উপযোগী স্বতন্ত্র গণপরিষদ স্থাপনের প্রস্তুতিরূপে। আর সে সংবিধানের ভিত্তি হতো স্বভাবতঃই লাহোর প্রস্তাব। লাহোর প্রস্তাবে উল্লেখিত 'রাষ্ট্রসমূহের' কথাটির পরিবর্তে দিল্লী প্রস্তাবে শুধু 'রাষ্ট্র' কথাটি ব্যবহার করা হয়, এ কথা ঠিক। জনাব আবুল হাশিম এর বিরোধিতা করলে, কায়েদে আজম দিল্লী প্রস্তাবকে মুসলমানদের আবাসভূমির জন্য একটি স্বতন্ত্র গণপরিষদ গঠনের কাঠামো হিসেবেই বর্ণনা করেন এবং প্রস্তাবটি যে লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনী নয় সে কথাও তিনি বলেন। এই কারণেই দেশ বিভাগের প্রাক্কালে দিল্লী প্রস্তাবের উত্থাপক জনাব সোহরাওয়ার্দী কায়েদে আজমের অনুমোদন নিয়েই স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করতে পেরেছিলেন। তাঁর এই প্রস্তাব সফল হয়নি; তার কারণ কায়েদে আজমের বিরোধিতা নয়, বরং কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের বিরোধিতা এবং সোহরাওয়ার্দী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এই পূর্ব-পাকিস্তানেরই কতিপয় মুসলিম লীগ নেতার উঠে পড়ে লাগা। কিন্তু তবুও, সোহরাওয়ার্দীর স্বাধীন বাংলা প্রস্তাবের যারা সেদিন বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরাও, দিল্লী প্রস্তাব গৃহীত হবার পরেও, লাহোর প্রস্তাবের নামেই জনগণের কাছে হলফ করেছেন এবং লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই পাকিস্তান গঠনের আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছেন জনগণের কাছে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার সাক্ষ্য বিদ্যমান।

তাছাড়া মুসলিম লীগের নথিপত্র ঘাটলেও দেখা যাবে, দিল্লী প্রস্তাব গৃহীত হবার বহু পরে অখিল ভার মুসলিম লীগের সেক্রেটারী জেনারেল নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান লীগের যে গঠনতন্ত্র পুনর্মুদ্রণ করেছিলেন তার উদ্দেশ্যাবলীর (aims and objects) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল পুরোপুরি লাহোর প্রস্তাবটিকেই—দিল্লী প্রস্তাবকে নয়। উপরন্ত দিল্লী প্রস্তাব পাশের পরে আমাদের

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে গৃহীত পরবর্তী কার্যক্রমের কোন পর্যায়েই দিল্লী প্রস্তাবের কোন উল্লেখই কখনও ছিলনা।

এইসব ঐতিহাসিক তথ্যের বিপরীত যুক্তি বা ভাষ্য গ্রহণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী দলিল সংশোধন করে নিতে হবে, কারণ, এ-সব দলিলে কেবল লাহোর প্রস্তাবকেই পাকিস্তান প্রস্তাব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে; কাজেই এইসব দলিল সংশোধন করে দিল্লী প্রস্তাবকে লাহোর প্রস্তাবের পরিবর্তে না হলেও অন্ততঃ বিকল্পরূপে সম-মর্যাদায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, যে প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হল, তার উত্থাপক কে ছিলেন, এ প্রশ্নটিরও একটা চূড়ান্ত সুরাহা করা দরকার হবে। অন্যথায়, পাকিস্তান প্রস্তাবের উত্থাপক জনাব এ, কে, ফজলুল হক, না জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী, এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই ইতিহাস-পাঠকদের মনে বরাবরের জন্য একটি খটকা হয়ে থাকবে।

তৃতীয়তঃ যদি ধরে নেয়া যায় যে, যেহেতু লাহোর প্রস্তাবটি পরবর্তী পর্যায়ে সংশোধন করা হয়েছিল সেহেতু তাকে পাকিস্তান প্রস্তাবের ভিত্তি বলে গ্রহণ করা যায়না, তাহলে লাহোরে পাকিস্তান মনুমেণ্ট নামে যে সুবিশাল স্মৃতিসৌধটি নির্মাণ করা হয়েছে তাও অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং তাকে আর এ নামে ডাকাও চলে না। কিন্তু পাকিস্তানে এমন কেউ নেই যিনি এ মতের সমর্থন করবেন। তার কারণ এ নয় যে, এ ধরনের উক্তি উদ্ভট চিন্তাপ্রসূত, বরং এই যে, তা ঐতিহাসিক সত্যের পরিপন্থী।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু লোক কার্যত তাঁদের এ ধরনের উদ্ভট চিন্তার ফসল জনগণকে উপহার দিতে চান এবং তাঁদের নিজেদের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত অভিনব ধরনের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে চান। আর এই অপপ্রয়াসে তাঁরা

উদ্দেশ্যমূলকভাবে দিল্লী প্রস্তাবের উত্থাপক জনাব সোহরাওয়ার্দীকেও জড়াতে চান।

আমাদের জাতীয় জীবনের দীর্ঘ ২৩ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম বারের মতো একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই লগ্নে প্রত্যেকের উচিত বুকে হাত রেখে এই শপথ নেয়া যে, আমরা ইতিহাসকে বিকৃত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত না হয়ে জনগণকে জাতির পিতার প্রতিশ্রুত ও লাহোর প্রস্তাবে উদ্দিষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির মঞ্জিলে উপনীত হবার পথে সঠিক নেতৃত্ব দিতে আগুয়ান হব। প্রস্তাবিত নতুন দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর প্রশ্নে ১৯৪৬ সালের দিল্লী প্রস্তাব গ্রহণের ফলে লাহোর প্রস্তাবটি উহ্য অপাংক্তেয় অথবা অকার্যকরী হয়ে গেছে কিনা এ বিষয় সন্দিহান ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত হবে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা মন নিয়ে ইতিহাস এ প্রশ্নে কি বলে তা ঘেটে দেখা।

'পরিবর্তিত অবস্থার' প্রেক্ষিতে লাহোর প্রস্তাবটিকে সংশোধন করে কালোপযোগী ক'রে তোলার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল বলে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়, তা যুক্তির নামে নির্জলা মিথ্যার বেসাতি বই নয়। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের অব্যবহিত পরে এমন কিছু নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেনি কিংবা কোন প্রদেশ বিভাগ সম্পর্কে তখনো এমন কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি যার ফলে লাহোর প্রস্তাবের সংশোধন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। বরং তারও প্রায় বছর খানেক পরেই কেবল আমাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের দাবী তুলেছিলেন। এতৎসত্ত্বেও লাহোর প্রস্তাবের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ও জনগণের কাছে অম্লানই থেকে যায়। আমার এই মতের প্রমাণস্বরূপ আমি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কর্তৃক ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন তারিখে প্রদত্ত দেশবিভাগ সংক্রান্ত বৃটিশ সরকারের পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কিত

ঘোষণার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কয়েক মাসের প্রায় প্রতিদিনের ঘটনার একটি নির্ঘণ্ট পাঠকদের কাছে পেশ করার প্রয়াস পেয়েছি। সামনের অধ্যায়গুলোর পাঠ থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, আমাদের প্রতিশ্রুত জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে কোন্‌টি আসল ও প্রাসঙ্গিক—লাহোর প্রস্তাব, না দিল্লী প্রস্তাব। অথবা আমাদের জাতীয় জীবনের নানা ক্রান্তিলগ্নে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাজনিত বঞ্চনার যে ইতিহাস রচিত হযে এসেছে, এ থেকে তাও স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে।

১২ কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সঙ্গতিপূর্ণ একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হলে আমাদের অতীতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসকে বিস্মৃত হলে চলবেনা। আজাদী লাভের প্রাক্কালে কারা কি ভাবে কেন জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দীর মত নেতার পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করেছিল এবং তাঁর চরিত্রকে নানা কল্পিত কলঙ্ক ও অপবাদে মসীলিপ্ত করার অপচেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছিল, অতীতের এই ইতিহাসের পাতা থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে।

দর্পণে এক নজরে

দিল্লী প্রস্তাব গৃহীত হবার প্রায় এক বছর পর বাংলার রাজনীতিতে এক নয়া বিতর্কের সূত্রপাত হয়। হিন্দু মহাসভা নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অবিভক্ত বাংলার শেষ গভর্ণর ফ্রেডারিক বারোজের সাথে সাক্ষাৎকারের পর ১৯৪৭ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে দাবী করেন যে, ভারত বিভাগ করা হলে বাংলাকেও বিভাগ করতে হবে, কারণ বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। হিন্দু মহাসভার এই দাবীর প্রতি প্যাটেলের নেতৃত্বে কংগ্রেসের অবাংগালী কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্টীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কংগ্রেস হাইকমাণ্ড ও মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীকে নস্যাৎ

করার কিংবা অন্ততঃ বিকলাঙ্গ করার ধন্বন্তরী হিসাবে হিন্দু মহাসভার এই দাবীকে লুফে নেয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস প্রধান সৌরীন্দ্রমোহন ঘোষ, কিরণশঙ্কর রায়, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ বাংলার শীর্ষস্থানীয় হিন্দু নেতারা কংগ্রেসের অবাঙ্গালী কায়েমী স্বার্থবাদী-গোষ্ঠীর এই হীন চক্রান্তের আসল মতলব বুঝতে পেরে কালক্ষেপ না করে বাংলার মুসলিম লীগ নেতাদের সংগে বাংলার ভবিষ্যৎ রূপ কাঠামোর প্রশ্নে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। বাংলার লীগ নেতৃত্ব অবশ্য বঙ্গ-ভঙ্গের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ১৯৪৭-এর মাঝা-মাঝি সময়ে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট আচার্য কৃপালনী বাংলা বিভাগের সমর্থনে বিবৃতি দেওয়ার ফলে বঙ্গ-ভঙ্গের দাবীটি রীতিমত একটি প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়।

হিন্দু মহাসভার পাকিস্তান ব্যবচ্ছেদ উদ্যোগ

দিল্লী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিলো ১৯৪৬-এর ৯ই এপ্রিল আর তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনে দেশের 'সকল জাতীয়তাবাদী শক্তির' সহযোগিতায় বাংলার হিন্দুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি রচনার উদ্দেশ্যে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে ক্ষমতা প্রদান করা হয় ১৯৪৭-এর ৫ই এপ্রিল তারিখে। এই হিন্দু সম্মেলনে আরো যে সব সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তাতে বলা হয়: বঙ্গ-ভঙ্গ দাবীর সমর্থনে প্রচণ্ড প্রচারকার্য চালাবার জন্যে (সে-বছরই) ৩০শে জুনের মধ্যে এক লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ ও প্রতিটি জেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামে স্থানীয় কমিটি স্থাপন করা হবে; সীমানা নির্ধারণের জন্যে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে; সীমানা নির্ধারণ কমিশন নিয়োগের জন্যে গণপরিষদের কাছে আবেদন করা হবে; ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বেই নতুন প্রদেশ সৃষ্টির জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও কেবিনেট মিশনের কাছে দাবী পেশ করা হবে; 'প্রয়োজনবোধে নতুন প্রদেশ-

ভুক্ত হিন্দু পরিষদ সদস্যদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র আইন পরিষদ গঠন করা হবে; এবং নতুন প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের ব্যবস্থাদি পূর্বাহ্ণেই সুসম্পন্ন করে রাখা হবে।

সম্মেলনে হিন্দুদের প্রতি অবিলম্বে প্রত্যেক ইউনিয়নে হিন্দুস্থান জাতীয় রক্ষীবাহিনী (ন্যাশনাল গার্ড) বা হিন্দুস্থান রাষ্ট্রীয় সেনা নাম দিয়ে মিলিশিয়া গঠনেরও আহ্বান জানান হয় এবং সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভাকে অপসারণ করে দুইটি আঞ্চলিক মন্ত্রিসভা গঠনের দাবী উত্থাপন করা হয়।

এই সম্মেলন উপলক্ষে প্রেরিত এক বাণীতে হিন্দু মহাসভা নেতা শ্রী ভি, আর, সাভারকার বলেন: "অখণ্ড হিন্দুস্থানের ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনা বানচাল করতে হলে হিন্দুদের সর্বাগ্রে পাকিস্তান ব্যবচ্ছেদে উদ্যোগী হতে হবে। প্রথমতঃ পশ্চিমবঙ্গে একটি হিন্দু প্রদেশ পত্তন, দ্বিতীয়তঃ, যে কোন মূল্যে আসাম থেকে মুসলিম অনধিকার প্রবেশকারীদের বিতাড়ন করে দুইটি হিন্দু প্রদেশের মাঝে ফেলে পূর্ব-পাকিস্তানকে পিষে মারা এবং তৃতীয়তঃ, পূর্ব পাঞ্জাবে একটি হিন্দু শিখ প্রদেশ প্রতিষ্ঠাই হবে এই পরিকল্পনার মূখ্য উদ্দেশ্য ও প্রথম কাজ।

আসামের ঘটনাপঞ্জী

১৯৪৭ সালের ৮ই এপ্রিল রংপুরের সালারে-জেলা মৌলভী খয়রাত হোসেন, এম, এল, এ, (বাংলা) মাইনকাচর থেকে ধুবড়ী যাবার পথে আরো ৩৮ জন মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডসহ আসাম নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স অমান্যের দায়ে গ্রেফতার হন। গ্রেফতার হবার পর জনাব হোসেন ভারতের, বিশেষ করে বাংলা ও আসামের মুসলমানদের প্রতি বরদলুই সরকারের জুলুমশাহী উৎখাত করার আহ্বান জানান। তাঁর গ্রেফতারের প্রতিবাদে প্রায় ১০ হাজার

মুসলমান স্বেচ্ছায় গ্রেফতার হবার জন্য সেদিন ঘটনাস্থলে সমবেত হন। বিক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশকে বেয়নেট ব্যবহার করতে হয়। বিক্ষোভকারীরা আদালতকক্ষে মুসলিম লীগ পতাকা উত্তোলন করেন।

৭ই এপ্রিল দাঙ্গা বিধ্বস্ত কলকাতায় আপেক্ষিক শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান থাকে। সান্ধ্য আইন শিথিল করা হয়। এই দিনই জনাব এম, এ, জিন্নাহ্ নয়াদিল্লীতে ভারতের নব-নিযুক্ত গভর্ণর জেনারেল মাউণ্টব্যাটেনের সংগে প্রথম আলোচনায় শরীক হন। তাঁদের প্রথম দিনের এই বৈঠক আড়াই ঘন্টা স্থায়ী হয়।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও দেশবিভাগ প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দী

৮ই মে কলকাতার শেরিফ 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপায়' সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি সভা আহবান করেন। সভায় ভাষণ দান প্রসঙ্গে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী ঘোষণা করেন যে, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শহরের পুলিশ বাহিনীকে প্রয়োজনানুরূপ সম্প্রসারণ করার ও তজ্জনিত বর্ধিত ব্যয়-নির্বাহের উদ্দেশ্যে কলকাতার নাগরিকদের উপর অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য করার একটি প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, "এই সমস্যার একটা সুরাহা করতেই হবে। না হলে আগুন জলে উঠবে সারা ভারত জুড়ে।

জনৈক সদস্য স্থায়ী শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলার বিভাগই একমাত্র সমাধান বলে মন্তব্য করলে তার জবাবে জনাব সোহরাওয়ার্দী বলেন: বিহার, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বে, আহমেদাবাদ ও অন্যান্য স্থানে কলকাতার চাইতেও নৃশংসতম দাঙ্গা-হাঙ্গামা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে কি বলতে হবে বিহার, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বে আহমেদাবাদের মত ভারতের যত জায়গায় দুই জাতির মধ্যে সংঘর্ষ দেখা

দিয়েছে সেখানেই এই বিভাগ-সূত্র প্রয়োগ করাই বাঞ্ছনীয়? সভায় অখিল ভারত ব্যবসায়-বাণিজ্য সংসদ ও রোটারী ক্লাবের প্রতিনিধিরাও যোগদান করেন।

যুক্ত বাংলার স্বপক্ষে সোহ্‌রাওয়ার্দী

দিল্লী প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পুরো এক বছর পর ১৯৪৭ সালের ৯ই এপ্রিল সাংবাদিকদের সংগে আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দু নেতাদের বঙ্গ-ভঙ্গ দাবীর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে জনাব সোহরাওয়ার্দী দৃঢ়তার সংগে ঘোষণা করেন যে, বাংলাকে কিছুতেই দ্বিখণ্ডিত করা চলবে না। তিনি বলেন: আমি বরাবরই যুক্তবাংলা ও বৃহত্তর বাংলার পক্ষে। আমি যথাসময়ে বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোকপাত করে একটি বিবৃতি দেব এবং তাতে প্রমাণ করবো যে, বঙ্গবিভাগ বাঙ্গালী হিন্দু মুসলিম তফসিলী সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের জন্য আত্মহত্যারই সামিল হবে। আমি জানি, যে মহাত্মাঁরা এই জিগীর তুলেছেন তাঁরা মতলবী প্রচারণায় সিদ্ধহস্ত। তারা আন্দোলন গড়ে তুলতে, সে আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চার করতে এমন কি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দুদের বিভ্রান্ত করে সে আন্দোলনে তাদের সমর্থন আদায় করতেও কোন কসুর করবেন না।"

উপসংহারে জনাব সোহরাওয়ার্দী বলেন "তবে এখনো আমি আশা করি, একদিন না একদিন শুভবুদ্ধির জয় হবেই; তাই আমি আশা করব, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গের চেষ্টা করার আগে তাঁরা অবিশ্যিই একটি সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হবার চেষ্টা করবেন এবং সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলাকে একটি মহান দেশ এবং বাঙালীদের একটি মহান জাতিতে পরিণত করার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবেন।"

সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপক্ষে ফজলুর রহমান

একই দিন বাংলার তদানীন্তন ভূমি-রাজস্ব ও জেল দফতরের মন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন: "অন্যান্য প্রদেশ যখন কেন্দ্রের সাহায্য নিয়ে শিল্প, বাণিজ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে ধাপে ধাপে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে তখন বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার যে বিমাতাসুলভ ব্যবহার করে চলেছেন, সে সম্পর্কে হিন্দু নেতারা পুরোপুরিই ওয়াকিফহাল। আমাদের সম্পদের প্রাচুর্য সত্বেও আমরা যে তিমিরে ছিলাম সে তিমিরেই রয়ে গেছি। এই অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই উচিত জাতীয় স্বার্থের তাগিদে বাংলার কাঁধ থেকে কেন্দ্রের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে প্রগতির পথে কদম কদম এগিয়ে চলা।

"তাঁরা যদি বলেন যে, তাঁদের ভাষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা মুসলমানদের থেকে স্বতন্ত্র এবং একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলার সমবায়ে নতুন প্রদেশ গঠনের মাধ্যমেই তা রক্ষা করা সম্ভব, তাহলে আমাদের জিজ্ঞাস্য: বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে লোক বিনিময়ের মাধ্যমে সংখ্যালঘু সমস্যার সুরাহা ক'রে তাঁরা বাস্তববাদী রাষ্ট্রনীতিকের মতো এই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানে অগ্রসর হন না কেন? উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ছাড়া গোটা ভারতই তো তাঁদের। ঐ দুটি অঞ্চল তাঁরা ছেড়ে দিন মুসলমানদের জন্য। কায়েদে আজমের প্রস্তাব অনুসারে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা, সাংস্কৃতিক ঐক্য ও রাজনৈতিক সমঝোতার ভিত্তিতে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশীর মতো সার্বভৌম ও স্বাধীন সত্তায় আমরা গড়ে তুলব এই অঞ্চল দু'টোকে।

দেশবিভাগ প্রশ্নে মর্নিং নিউজ

দৈনিক মর্নিং নিউজ ১০ই এপ্রিল (১৯৪৭) সংখ্যায় এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন :

...উদাহরণস্বরূপ, বাংলা প্রদেশের রাজনৈতিক জীবনে ও সাধারণ প্রশাসন ক্ষেত্রে বিহারের হিন্দুদের চাইতে বাংলার হিন্দুদের ভূমিকা বহুগুণে বৃহৎ ও ব্যাপক। কিন্তু এতেও যদি তাদের প্রাধান্য ও ক্ষমতা লিপ্সা তৃপ্ত না হয় তাহলে, কায়েদে আজমের প্রস্তাব মতো, এর একমাত্র সমাধানই হবে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে উভয় সম্প্রদায়ের লোক বিনিময়।

"--মুসলিম বাংলা যে-কোন মূল্যের বিনিময়ে বাংলার অখণ্ড সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা আমাদের এলাকার এক ইঞ্চি ভূমিও ছাড়তে রাজী নই। কূটবুদ্ধি ও শঠতার মাধ্যমে জন্মের আগেই পাকিস্তানের বিরাট বিরাট অংশ ছিনিয়ে নেয়া হলে সে পাকিস্তানের আর কানাকড়িও মূল্য থাকবে না। বাংলা বিভাগের জিগির আতঙ্কগ্রস্ত হিন্দু প্রতিক্রিয়ার কায়েমী স্বার্থ ও একচেটিয়া অধিকার রক্ষার অন্তিম প্রয়াস বৈ নয়। আমরা আশা করি শুভবুদ্ধির জয় হবে, এবং বাংলার হিন্দুরা—জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর অনুপম ভাষায় বলতে গেলে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গের কুমন্ত্রণায় বিভ্রান্ত হবেন না।

তারা সিংয়ের ১৯৪০-এর পরিকল্পনা

এইদিন কলকাতার দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত এক সংবাদে প্রথম প্রকাশ পায় যে, ১৯৪০ সালে মাষ্টার তারা সিং বৃটিশরা তাদের নাৎসী-বিরোধী জীবনমরণ যুদ্ধে পর্যুদস্ত হলে বিকানীর ও সীমান্ত প্রদেশ থেকে চোরাচালানকৃত অস্ত্রের সাহায্যে পাঞ্জাব জয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন। অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভার দেশরক্ষা-সদস্য সর্দার বলদেব সিংয়ের মালিকানাধীন শিখ পত্রিকা 'অজিত'-এ এক স্বাক্ষরিত প্রবন্ধে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়।

হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দাবী

১১ই এপ্রিল, ১৯৪৭ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে বাংলার ১১ জন হিন্দু প্রতিনিধি ভাইসরয় লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের নিকট পেশকৃত এক স্মারকলিপিতে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডের আওতায় পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে একটি স্বতন্ত্র স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ গঠনের দাবী করেন।

লীলা রায়ের ঢাকা সফরের অভিজ্ঞতা

১৫ই এপ্রিল, ১৯৪৭ বাংলার ফরওয়ার্ড ব্লকের অন্যতম নেত্রী শ্রীমতী লীলা রায় তাঁর ঢাকা জেলা সফর ও বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতার অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে বলেন:

"বঙ্গবিভাগ দাবীর সমর্থকদের সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয়।" ফরওয়ার্ড ব্লক-নেতা শ্রীকামাথও বাংলা বিভাগ দাবীর বিরোধিতা ক'রে ঐদিন মন্তব্য করেন: "এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, যে-বাংলা ৪০ বছর আগে বিভাগের বিরুদ্ধে লড়েছিল সে-বাংলাই আজ আবার বিভাগের দাবীতে মুখর হয়ে উঠছে।"

সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে বাংলা লীগ নেতৃবৃন্দের চক্রান্ত

সংবাদপত্রে, বিশেষতঃ কলকাতার দুইটি মুসলিম লীগ দৈনিকে প্রকাশিত একটি খবর থেকে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে, জনাব সোহরাওয়ার্দীকে ক্ষমতাচ্যুত করার কিংবা অন্ততঃ তাঁর ক্ষমতাকে খর্ব করার জন্য বাংলা লীগ নেতৃত্বের একটি অংশ সক্রিয়ভাবে চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছিলেন। খবরটিতে বলা হয়: ১৫ই এপ্রিল নয়াদিল্লীতে নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী বোর্ডের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। খাজা নাজিমুদ্দিন এবং বাংলা সফর থেকে সদ্য-প্রত্যাগত চৌধুরী খালিকুজ্জামানও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বোর্ড (জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পরিচালিত) বাংলা মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব'লে জানা যায়। পূর্বাহ্নে বাংলা মুসলিম লীগের অস্থায়ী সেক্রেটারী জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী, বাংলা আইন পরিষদের স্পীকার জনাব নূরুল আমীন ও বাংলার অপর কয়েকজন এম, এল, এ, নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার পুনর্গঠন

১৮ই এপ্রিল 'মর্নিং নিউজের প্রথম পৃষ্ঠায় "বাংলায় মন্ত্রীসভার পুনর্গঠন সুনিশ্চিত: দিল্লী-প্রত্যাগত লীগ নেতাদের অভিমত" শিরোনামায় একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে জনাব নুরুল আমিন, হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী, ইউসুফ আলী চৌধুরী এম,এল. সি, শরফুদ্দিন আহম্মদ এম, এল, এ, ওয়াহিদুজ্জামান এম, এল, সি, ও ইউসুফ হোসেন চৌধুরীর বরাত দিয়ে বলা হয় যে, সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনের দাবীতে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে স্বাক্ষরকারীদের প্রতিনিধি হিসেবেই তাঁরা দিল্লী গমন করেছিলেন ব'লে তাঁদের জনৈক মুখপাত্র প্রকাশ করেন। রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, তাঁরা জিন্নাহ-লিয়াকত আলী, চুন্দ্রীগড়, খালিকুজ্জামান ও লীগ হাইকমাণ্ডের অন্যান্য সদস্যের সংগে আলাপ-আলোচনা করেন এবং কেন্দ্রীয় লীগ পার্লামেণ্টারী বোর্ড মন্ত্রীসভা পুনর্গঠনের জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রিকে (জনাব সোহরাওয়ার্দী) সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দান করেছেন। বাংলা মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য হাইকমাণ্ডের কাছে কয়েকটি নাম পেশ করা হয়েছে ব'লেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

"মুসলমানরা কি চায়"

—মর্নিং নিউজ

১৮ই এপ্রিল মর্নিং নিউজ "মুসলমানরা কি চায়" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন: "ইউনাইটেড প্রেস অব আমেরিকা বিশেষ করে ভারতের আকাশে রাজনৈতিক জল্পনার ঘুড়ি উড়ানোর কঠিন বিদ্যায় শনৈঃ শনৈঃ নৈপুণ্য অর্জন করে চলেছেন--- মুসলিম লীগ কর্তৃক এমন কি মাত্র দশ বছরের জন্যও একটি সাধারণ কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নেয়ার সকল জল্পনা-কল্পনা দিবাস্বপ্ন বই কি কিছু নয়। মুসলিম লীগের সুস্পষ্ট দাবী: ভারতের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের 'বর্তমান প্রাদেশিক সরকারসমূহের কাছে' ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।"

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সোহরাওয়ার্দীর আকুল আবেদন

ইতিমধ্যে কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরিস্থিতিতে অবনতি ঘটে। মুখ্যমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দী ২১শে এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন: "এই অরাজকতা ও জিঘাংসাবৃত্তি থেকে বিরত হোন। আসুন, আমরা শপথ নিই, আমরা সম্মিলিতভাবে আত্মনিয়োগ করবো শান্তি ও সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে এবং এই নিশ্চয়তা বিধানের জন্য যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার পর আমাদের রাজনৈতিক ভাগ্যে যে বিপর্যয়ই ঘটুক না কেন, সেই শান্তিকে আমরা আর কোনক্রমেই বিঘ্নিত হতে দেবো না।" তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে বিরত হ'য়ে সৌ-ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আকুল আবেদন জানান।

তিনি বলেন: "এই জিঘাংসার নিবৃত্তি করুন। আপনারা যা কিছু পবিত্র জ্ঞান করেন তার স্বার্থে, আপনাদের নারী ও শিশুদের স্বার্থে, শান্তি, সম্প্রীতি ও শৃংখলার স্বার্থে, জনসাধারণের দরিদ্রতম যে অংশ নিপীড়িত হয় তাদের স্বার্থে এবং যে নিরপরাধ মানুষরা যারা কারও

কিছুমাত্র ক্ষতি করে নাই কিন্তু অবস্থা বৈগুণ্যে নিজেদের ও পরিবার-পরিজনের জীবিকার্জনের জন্য বাইরে বেরুতে বাধ্য হয় তাদের স্বার্থে এই নৃশংসতার অবসান করুন।"

(পূর্ণ বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট-গ দেখুন)

ভারত বিভক্তি অত্যাসন্ন ব'লে 'ডেলী হেরাল্ডে'র অভিমত

গ্লাসগোর 'ডেলী হেরাল্ড' ৩১শে এপ্রিল এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য করেন: "পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও গণপরিষদ অবশেষে এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন ব'লে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতের অবিভাজ্যতা অব্যাহত রাখার সম্ভাবনা আর নেই।--- সমুপস্থিত বর্তমানের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা মুসলিম লীগের বিজয় ব'লেই মনে হতে পারে। ধ'রে নেয়া যেতে পারে যে, মুসলিম লীগ তাঁদের ঈপ্সিত পাকিস্তান লাভে সক্ষম হবেন, কিন্তু এমন বিক্ষত আকারে ও বিচ্ছিন্ন এলাকা সমবায়ে যে সেখানে প্রশাসনিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। হিন্দুদেরকে পক্ষান্তরে আবার এমন একটি বিভক্ত বাংলা গ্রহণ করতে হবে যার বিরুদ্ধে ৪০ বছর আগে কার্জনের ভাইসরয়গিরির আমলে তারা তুমুল প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলো।"

বিহারের দ্বিধাবিভক্তি দাবী

২৩শে এপ্রিল গয়া মুসলিম সম্মেলন বিহারের বিভক্তিকরণ দাবী করে। সম্মেলনের আহ্বায়ক জনাব মাহবুব আহমদ ওয়ার্সী দাবীর সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন: "বাংলায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু হলেও তারা জনসংখ্যার শতকরা ৪৬ ভাগ, আর সংখ্যাগুরু মুসলমানদের সংখ্যাগত প্রাধান্য জনসংখ্যার মাত্র ৫৪ ভাগ। তবুও যদি বাংলার হিন্দুরা মুসলমানদের প্রতিপক্ষে নিজেদের দুর্বল মনে করে, তাহলে বিহারের যে মুসলিম সম্প্রদায় জনসংখ্যার মাত্র ১৩ ভাগ তারা কি করে একটি

পূর্ণতঃ অস্ত্রসজ্জিত আগ্রাসী সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রতিপক্ষে নিজেদের নিরাপদ জ্ঞান করতে পারে?"

জমিদারী দখল বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত

এই দিনই ভূমিরাজস্ব ও কারাবিভাগের মন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমান আইন পরিষদে বঙ্গীয় জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব বিল উত্থাপন করেন। বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। সিলেক্ট কমিটিতে যাঁরা সদস্য ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন: জনাব হামিদুদ্দিন আহমদ, আবদুস সালাম, জসিমুদ্দিন আহমদ, দেওয়ান লুৎফর রহমান, মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী, আবুল হাশিম, কাজী আবদুল মাসুদ, আবদুর রশীদ মাহমুদ, সি. পি. জি. ওয়েড, ফজলুল কাদের, ঈশ্বরচন্দ্র মাল, মোহিনী মোহন বর্মন, বিমলচন্দ্র সিংহ, মহারাজ সিতাংশুকুমার আচার্য, সুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় এবং ফজলুর রহমান। কমিটিকে ১৫ই জুলাই ১৯৪৭-এর মধ্যে রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়।

কলকাতায় দাঙ্গা পরিস্থিতির অবনতি

২৫শে এপ্রিল কলকাতায় সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিব অবনতি ঘটে। বেলিয়াঘাটা ও মানিকতলা এলাকা দুটিতে সান্ধ্য আইন জারীও ৫৯ ঘন্টা যাবৎ বলবৎ করা হয়।

সোহরাওয়ার্দীর স্বাধীন বাংলা প্রস্তাব

১৯৪৭-এর ২৭শে এপ্রিল বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী নয়াদিল্লীতে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন। বিবৃতিতে তিনি বাংলার জন্য 'অবিভক্ত ও স্বাধীন রাষ্ট্রের' মর্যাদা দাবী করেন এবং

দাবীর সমর্থনে বিস্তারিত তথ্য ও পরিসংখ্যানসহ যুক্তি প্রদর্শন করেন। এই দীর্ঘ বিবৃতিটি অধিকাংশ দৈনিকে প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও ক'রে ছাপা হয়। 'মর্নিং নিউজ' বিবৃতিটি জনাব সোহরাওয়ার্দীর প্রতিকৃতিসহ ঐদিনের প্রথম খবর হিসেবে প্রকাশ করেন এবং এর শিরোনাম দেন: "বাংলায় অবিভক্ত ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী: সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্রকল্প অঙ্কন: বঙ্গ-বিভাগ দাবীতে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা: সার্বভৌম ও অবিভক্ত দেশের নীতি গ্রহণের জন্য হিন্দুদের নিকট আবেদন।"

মর্নিং নিউজ বিবৃতিটি পরিবেশন করেন এইভাবে: "বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী 'সুসংহত, অবিভক্ত ও সার্বভৌম' বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য উদাত্ত আহবান জানান। তিনি বলেন, সে স্বাধীন বাংলা হবে ভারতের মধ্যে সবচাইতে ধনাঢ্য ও ঋদ্ধিশীল দেশ---যেখানে জনগণ উন্নত জীবনযাত্রার মানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে এবং যেখানে একটি মহান জাতি তার উৎকর্ষের শীর্ষতম সোপানে উপনীত হতে সক্ষম হবে। সত্যিকার অর্থে প্রাচুর্যে ভরা একটি দেশ হবে এই বাংলা।

"বাংলা বিভাগের দাবীটি হিন্দু সমাজের একাংশের তীব্র হতাশা থেকে উদ্ভূত ব'লে উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন যে, এমন কি হিন্দু স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকেও বঙ্গবিভাগ আত্মহত্যারই সামিল হবে। তিনি বঙ্গবিভাগ দাবীর বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করেন।

"আজ সন্ধ্যায় এখানে (নয়াদিল্লীতে) এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণদানকালে জনাব সোহরাওয়ার্দী বলেন যে, বাংলায় অনুরূপ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর বাঙালী জাতিই হবে বাংলার ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। যাঁরা বাংলা বিভাগের ধ্বনি তুলেছেন, তাঁদের কাছে এই চরম অশুভ সম্ভাবনাময় দাবীটি প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়ে জনাব সোহরাওয়ার্দী বলেন, 'সবাই মিলে আলোচনার মাধ্যমে

নিশ্চয়ই আমরা এমন একটি প্রশাসন ব্যবস্থার উদ্ভাবন করতে পারবো, যা জনগণের সকল অংশেরই মনঃপূত হবে এবং বাংলার হারানো গৌরব ফিরে পাবার পথ প্রশস্ত হবে।"

"জনগণ, বিশেষ ক'রে হিন্দুসমাজ যাতে এ-প্রশ্নে চূড়ান্তভাবে মনস্থির করতে পারেন, তার জন্য নিজ কল্পিত বাংলার ভবিষ্যতের একটি চিত্ররূপ উপস্থাপনের জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলে তার জবাবে জনাব সোহরাওয়ার্দী বলেন, 'বাঙালীরাই স্থির করবে, তাঁদের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলার ভবিষ্যত চেহারা কি হবে। বাংলার হিন্দুরা শুধু যদি সার্বভৌম, অবিভক্ত বাংলার আদর্শটি গ্রহণ করে তাহলে আমি তাদের দাবী-দাওয়া পূরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।"

তাঁর পরিকল্পিত স্বাধীন বাংলা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হবে কিনা মিঃ সোহরাওয়ার্দী এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। অনুরূপ স্বাধীন বাংলায় তিনি যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন কিনা সে-বিষয়েও কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তিনি বলেন, 'আগে তো দেখি স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনার পরিণাম কি দাঁড়ায়। স্বাধীন বাংলাই তার নিজস্ব সংবিধান রচনা করবে। তা কিরূপ হবে তা আগে ভাগে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।'

"তাঁর পরিকল্পনাটি লীগ প্রেসিডেন্ট মিঃ জিন্নাহ ও হাইকমাণ্ডের অন্যান্য সহকর্মীর আশির্বাদপুষ্ট কি-না এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলেও তিনি তা এড়িয়ে যান, তিনি বলেন, 'আমার নিজের মনের কথাই বলছি। আমি বাংলার হ'য়ে বাংলার কথা বলছি। আমি বিভক্ত ভারতে একটি অবিভক্ত, স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলছি।'

"জনাব সোহরাওয়ার্দীকে আরো প্রশ্ন করা হয় ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যও অনুরূপ মনোভাব গ্রহণ করে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের যুক্তিতে স্বাধীনতা দাবী করবে বলে তিনি মনে করেন কিনা, এবং যদি তাই হয় তাহলে তিনি কি অনুরূপ স্বাধীন

ইউনিটসমূহের ভিত্তিতে একটি ফেডারেশন বা কনফেডারেশন গঠন করা হবে বলে মনে করেন ?

" শুধু বাংলার প্রশ্নেই তিনি আগ্রহী বলে পুনর্ঘোষণা করে জনাব সোহরাওয়ার্দী বলেন যে, এক সময় তিনি সে-রকমই মনে করতেন। তবে, 'কোনো রকম ফেডারেশনই উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না। মূল কর্তব্য হচেছ, বুনিয়াদী স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রসমূহ গঠন করা ; অনুরূপ রাষ্ট্রের নিজস্ব ভবিষ্যৎ নির্ধারণের স্বাধীন এখতিয়ার থাকবে। তবেই সত্যিকার অর্থে এমন একটি ফেডারেশন গঠন করা যাবে, যেখানে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলি স্বেচ্ছায় ফেডারেশনের স্বার্থে নিজেদের অধিকার সমূহের কিছুটা ছেড়ে দেবে। ফেডারেশনের ইমারত গড়ে তুলতে হবে নীচের ভিত্তিভূমি থেকেই। উপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে বলা চলবে না : কিছু কিছু ক্ষমতা তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে।'

"তবে, প্রত্যেক রাষ্ট্র কি সিদ্ধান্ত নেবে, এই মুহূর্তে সে প্রশ্নটি একেবারেই অনুমান সাপেক্ষ। প্রতিটি রাষ্ট্র স্বাধীন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। তবে, ভবিষ্যতের বাংলা প্রতিবেশী প্রদেশগুলোর প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হবে এই রকম মনে করা ভুল।

"বাংলার বিভাগ যদি অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে পড়ে তাহলে পূর্ব বাংলা একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে পারবে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে জনাব সোহরাওয়ার্দী বলেন, 'না পারার তো কোন কারণ দেখছি না। অবিশ্যি সেটা নির্ভর করে জনগণ কি পরিমাণ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত তার উপর। পূর্ব বাংলার জনগণ এবং আসামের যতটুকুই পূর্ব বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয় সেখানের জনগণ সম্মিলিতভাবে প্রয়োজনীয় কৃচ্ছ্রসাধনে পরাঙমুখ না হলে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অবশ্যই টিকে থাকতে পারবে।'

(বিবৃতির পূর্ণ বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট—ক দেখুন)

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার স্বপক্ষে নাজিমুদ্দীন

সেদিনই (২৭শে এপ্রিল, ১৯৪৭) খাজা নাজিমুদ্দীন এক বিবৃতিতে বলেনঃ "আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্রের পত্তন মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সমগ্র জাতির প্রকৃষ্টতম স্বার্থের অনুকূল। সমান দৃঢ়তার সংগে আমি এই অভিমতও পোষণ করি যে, বাংলার বিভাগ জাতি হিসাবে বাঙালীদের ধ্বংসেরই সামিল হবে।"

'মেকী আন্দোলনের' বিরুদ্ধে 'মর্নিং নিউজ' : লাহোর প্রস্তাবের উপর গুরুত্ব আরোপ

'মর্নিং নিউজ' ২৯শে এপ্রিল সংখ্যায় 'মেকী-আন্দোলন' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন :

"কংগ্রেসীরা ন্যায়নীতির ধার ধারেন না। সুবিচার-ভিত্তিক সমঝোতা স্থাপন তাঁদের কাম্য নয়। তাঁরা চান 'কাটছাঁট করা' একটা পাকিস্তান দিতে, যেটা মোদ্দা কথায় পাকিস্তান নামের যোগ্যই হবে না। এ-ধরনের মনোভাব কি বৃটিশ সরকারের পক্ষে সুশৃংখল-ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের সহায়ক হতে পারে? - - - কংগ্রেসীরা এই মারাত্মক ভ্রান্তিবিলাসে ভুগছেন যে, তাঁরা যদি (শাইলকের মতো) এক পাউণ্ড গায়ের মাংস দাবী ক'রে গলা ফাটিয়ে অবিরত চীৎকার করতে থাকেন, তাহলে মুসলমানেরা সশঙ্কে পাকিস্তান দাবী থেকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হবে। তাঁদের এই অনুমানে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। জনাব সোহরাওয়ার্দীর ভাষায়ই বলতে হয়, তাঁদের এই মনোভাবের মধ্যে শুধু চরম হতাশা নয়, চিন্তার বৈকল্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

"এইভাবে পাকিস্তান প্রস্তাব মেনে নেয়ার ভান করে কংগ্রেসীরা সাথে সাথে আবার যুক্তি দেখান যে, অনিচ্ছুক লোকদের পাকিস্তানে

থাকতে বাধ্য করা উচিত হবে না এবং এইরকম অনিচ্ছুক লোক-দের অধ্যুষিত এলাকাগুলোকে সেকারণে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিতে হবে। তা যদি হয়, তবে হিন্দুস্থানে বসবাসকারী কয়েক কোটি মুসলমানের সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্যটা কি? পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর মধ্যে যে-রকম ক্ষুদে ক্ষুদে হিন্দু অঞ্চল প্রতিষ্ঠার আব্দার করা হচ্ছে, অখণ্ড হিন্দুস্থানের মধ্যেও সে-রকম ক্ষুদে ক্ষুদে পাকিস্তান সৃষ্টিতে কি তবে কংগ্রেস প্রস্তুত আছে?

"কংগ্রেস যদি ন্যায়বিচারে বিশ্বাস করে এবং গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত করাই যদি তার চরম লক্ষ্য না হয়, **তাহলে তার উচিত হবে অখিল ভারত মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত পাকিস্তানের মৌলতত্ত্ব সম্পৃক্ত লাহোর প্রস্তাবটি তার পূর্ণ প্রেক্ষাপটে আন্তরিকতার সঙ্গে অধ্যয়ন ও অনুধাবন ক'রে বরণ করে নেয়া।"**

'বিবেক বর্জিত অসৎ ব্যক্তি': —মর্নিং নিউজ

৩০শে এপ্রিল ১৯৪৭ "বঙ্গের বিভাজন" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে মর্নিং নিউজ বলেন:

"বর্ণ হিন্দুদের একটি গোষ্ঠীর বঙ্গবিভাগ দাবীটি যে কত কৃত্রিম; সারবত্তাহীন ও অনিষ্টকারী সে বিষয়ে যদি কোন যুক্তির অবকাশ থাকে তাহলে বলা যায়, দিল্লীর এক সাম্প্রতিক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত জনাব সোহরাওয়ার্দীর অতুলনীয় ভাষণটি অনুরূপ যুক্তির পরাকাষ্ঠা। তাঁর ভাষণটি একজন বাস্তববাদী, অকুতোভয় ও অকপট দেশপ্রেমিকের অন্তরতম অনুভূতিরই বাণীমূর্তি। এই ভাষণে তিনি যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন, একমাত্র বিবেকহীন ও অদূরদর্শী অসৎ ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউ তাঁর সাথে দ্বিমত হতে পারে না। জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁর বিবৃতিতে যুগপৎ বাংলার অবিমিশ্র ঐক্য ও সার্বভৌমত্বে তাঁর বিশ্বাসের পুনর্ঘোষণা করেন এবং

পাকিস্তানকে নস্যাৎ করার জন্য ফ্যাসীবাদী কংগ্রেসের উদ্ভাবিত নবোদ্ভিন্ন কূটকৌশলের ইমারত ধূল্য-অবলুন্ঠিত করেন।

"জনাব সোহরাওয়ার্দী ঠিকই বলেছেন: 'এটা অবিশ্বাস্য যে, এমতাবস্থায় বাংলায় এমন কোন মন্ত্রিসভা টিকে থাকতে পারবে যা সমাজের সকল গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত হবেনা, কিংবা যা একটি অবিমিশ্র সাম্প্রদায়িক দলীয় মন্ত্রীসভা হবে, অথবা যা বর্তমানের চাইতে অধিকতর পরিমাণে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বশীল হবে না।' এমন কি বর্তমান মুহূর্তেও বাংলার মন্ত্রীসভাই হচ্ছে ভারতের মধ্যে সবচাইতে বেশী প্রতিনিধিত্বশীল মন্ত্রীসভা। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আরো আশ্বাস দিয়েছেন যে, তিনি 'হিন্দুদের দাবীপূরণে অনেক, অনেক দূর পর্যন্ত যেতে রাজী আছেন।"

অবিভক্ত সার্বভৌম বাংলার সপক্ষে আবুল হাশিমের আবেদন

মর্নিং নিউজের একই সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম সংবাদ হিসাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল হাশিমের একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিটির শিরোনাম দেয়া হয়: "যুক্তবঙ্গের সপক্ষে জনাব আবুল হাশিমের আবেদন: হিন্দু ও মুসলমান সমান অধিকার ভোগের জন্য একমত হোন: লাহোর প্রস্তাবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা: প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারা প্রত্যাখ্যান ক'রে প্রদেশকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করার আহ্বান।"

মর্ণিং নিউজের ৩০শে এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত জনাব আবুল হাশিমের বিবৃতিটি নিম্নরূপ:

"জনাব আবুল হাশিম এক বিবৃতিতে বলেন যে. বিভাগের মধ্য দিয়ে নয়, বরং অবিভক্ত ও সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কারণে তীব্র দেশাত্মবোধই হচ্ছে এই প্রদেশের সকল দুর্গতি অবসানের একমাত্র উপায়।

"জনাব হাশিম বলেন: 'সময় এসেছে যখন সত্যকে দিনের আলোকে উদ্ভাসিত করতেই হবে। সস্তা জনপ্রিয়তা ও সুযোগ-সন্ধানী নেতৃত্বের মোহে ক্লিষ্ট মানসিকতার বশবর্তী হওয়া চিন্তার পতিতাবৃত্তি বই কিছু নয়। এই সেদিন ১৯০৫ সালেও বাংলাই ছিল ভারতের চিন্তানায়ক; সেদিন প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধেও সাফল্যজনকভাবে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলো এই বাংলা। কি দুর্ভাগ্য, সেই বাংলা আজ চিন্তার ক্ষেত্রে দেউলিয়া এবং পথ-নির্দেশের জন্য ভিন্‌দেশী বীরকুলের মুখাপেক্ষী। ভাবতে বিস্ময় লাগে যে, বাংলার যে হিন্দুসমাজ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ মুখার্জী, চিত্তরঞ্জন দাস ও সুভাষচন্দ্র বসুর মতো পুরুষ সিংহের জন্ম দিয়েছিল সে হিন্দুসমাজের আজ হলো কি?

ভারতের আজিকার বিপ্লবী চিন্তাধারার সূতিকাগার এই বঙ্গদেশ। সত্যিকার বিপ্লবের উৎস অন্তর্ঘাতী দ্বন্দ্ব নয়' চিন্তায় ও মানসে সৃজনশীল বিপ্লবী চেতনার উন্মেষেই হচ্ছে তার জন্ম। বাংলাকে আজ আবার তার সকল হীনমন্যতা ও পরাজয়ী মনোবৃত্তির দীনতা ঝেড়ে মুছে নিজের বিস্মৃত ঐতিহ্যে পুনরাবর্তন করতে হবে এবং তার প্রতিভার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে আপন ভাগ্যের নিয়ন্তা হতে হবে। বস্তুনিষ্ঠ চিন্তার প্রকোষ্ঠে আবেগ ও ভাবালুতার কোন স্থান নেই। বর্তমানের বিভ্রান্ত চিন্তার বৈকল্য যেন আমাদের ভবিষ্যত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত না করে।

বাংলা আজ তার ভাগ্যের এক ক্রান্তি-লগ্নে সমুপস্থিত। তার সামনে পথ খোলা দুইটি—একটি স্বাধীনতা ও গৌরবের, অন্যটি অনন্তকালের জন্য দাসত্ব শৃংখল ও অশেষ নির্যাতনের। বাংলাকে এখানেই এবং এখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। মানুষের জীবনে কখনো কখনো এমন শুভলগ্ন দেখা দেয়, যে লগ্নের মাহেন্দ্রক্ষণে যাত্রারম্ভ হলে তা পরম সৌভাগ্যের অব্যর্থ লক্ষ্যেই সমাপ্ত হয়। সুযোগ একবার হারালে

আর কখনো নাও আসতে পারে। বাংলাকে শোষণের জন্য বিনিয়োগকৃত ভারতীয় ও ইঙ্গ-মার্কিন বিদেশী পুঁজির শতকরা একশত ভাগই লগ্নিকৃত পশ্চিমবঙ্গে। আমাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা লক্ষ্য করে এই বিদেশী শোষকেরা তাদের সম্পত্তি বাজেয়াফত হবার ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। অবিভক্ত ও স্বাধীন বাংলায় তাদের দশা কি হতে পারে সেটা আন্দাজ করতে পারার মতো বিচক্ষণতা তাদের আছে। এই বিদেশী পুঁজির স্বার্থেই বাংলাকে এমনভাবে বিভক্ত বিকলাঙ্গ ও প্রাণশক্তিহীন করার চক্রান্ত করা হচ্ছে যাতে করে বাংলার বিচ্ছিন্ন অংশ দুইটির কোনটিরই আর এমন বুকের পাটা না থাকে যাতে করে তারা ভবিষ্যতে এই পুঁজির অবাধ শোষণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে।

"তিনি যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন: প্যালেষ্টাইনে যেভাবে শক্তির নীতি প্রয়োগ করে বিদেশী লোকদের আমদানীর মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সৃষ্টি করা হচ্ছে কিংবা তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে যেভাবে লোকবিনিময়ের মাধ্যমে তা করা হয়েছিলো, সেভাবে একটি অখণ্ড মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা কৃত্রিম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা সৃষ্টি কখনোই লাহোর প্রস্তাবের লক্ষ্য ছিলো না।"

জনাব আবুল হাশিমের এই ভাবোদ্দীপক বিবৃতিটি প্রভূত পরিমাণে বাংলার ভবিষ্যত প্রশ্নে জনাব সোহরাওয়ার্দীর ভাবাদর্শের পরিপূরক হয়েছিলো।

(পূর্ণ বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট—ঘ দেখুন)

জনাব জিন্নাহ কর্তৃক বঙ্গবিভাগ দাবীর নিন্দা

ঐ দিনই জনাব এম, এ, জিন্নাহ বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের দাবীর তীব্র নিন্দা করে দাবীটিকে 'তিক্ততা ও বিদ্বেষপ্রসূত' বলে অভিহিত করেন। একই বিবৃতিতে তিনি একটি মুসলিম জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা দাবীর পুনরুক্তি করেন।

'গালিগালাজ ক'রে কি লাভ!'

—সোহরাওয়ার্দী

৭ই মে জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁর সমালোচকদের জবাবে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। ৮ই মে সংখ্যা মর্নিং নিউজের প্রথম পাতায় দ্বিতীয়-প্রধান সংবাদ হিসেবে বিবৃতিটি প্রকাশ করা হয়। মর্নিং নিউজের শিরোনাম ছিলো এরূপ: 'বঙ্গ-ভঙ্গ সমভাবে হিন্দু ও মুসলমানের ধ্বংসের সামিল: জনাব সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক অবিভক্ত সার্বভৌম বাংলা দাবী পুনর্ঘোষণা: ভবিষ্যৎ প্রশাসনের শরিকানা প্রশ্নে আলোচনার জন্য দলীয় নেতাদের প্রতি আমন্ত্রণ।' সংবাদটিতে বলা হয়: "জনাব সোহরাওয়ার্দী সমালোচকদের যুক্তি খণ্ডন করে বলেন: 'বিশেষ করে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী কঠোর ভাষা ও প্রচুর গালমন্দের মধ্য দিয়ে মনের ভার লাঘব করেছেন। কিন্তু গালিগালাজ করে বা উষ্মা প্রকাশ করে কি লাভ। আমাকে গালমন্দ দিয়ে, আমার আন্তরিকতার প্রতি কটাক্ষ করে, আমার কৃতির কুখ্যাতি ও আকৃতির সমালোচনা করে বা বাংলার সবকিছু দুর্দশার দুর্দৈবের জন্য আমাকে দায়ী ক'রে কার কি উপকার হবে?---বাংলার জনগণ ঐক্যবদ্ধ থেকে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যে মহান সমুন্নতির লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে তার সাথে বর্তমান সরকার বা মন্ত্রীসভার ত্রুটি-বিচ্যুতির, কিংবা এমন কি আমার ব্যক্তিগত পদমর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?"

(পূর্ণ বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট—খ দেখুন)

লাহোর প্রস্তাবের প্রতি জনাব আকরম খাঁ'র সমর্থন অব্যাহত

৫ই মে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ বিষয়টির উপর নতুন সুরের ধুন তুলে একটি বিবৃতি প্রদান

করেন, তবে তাঁর নতুন সুরের বন্দিশও তিনি ধরেন লাহোর প্রস্তাবকেই। তিনি বলেন:

"এই প্রশ্নে এমন ব্যাপক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে যে তা থেকে অনুমান করা হচ্ছে, পাকিস্তান প্রশ্নে লীগ হাইকমাণ্ড ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দিয়েছে। অনুমানটি সর্বৈব ভিত্তিহীন ও ভ্রান্তিপ্রসূত।

"**মুসলিম বাংলা ১৯৪০ সালের সুপ্রসিদ্ধ লাহোর প্রস্তাবে নির্দেশিত আদর্শের প্রতি দৃঢ়তার সংগে নিষ্ঠাবান** এবং কায়েদে আজমের নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আনুগত্যশীল রয়েছে। কায়েদে আজম তাঁর সর্বশেষ বিবৃতিতে যেমন বলেছেন, আমাদের আদর্শ—তাই: পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত, বেলুচিস্তান, বাংলা ও আসাম, এই ছয়টি ইউনিট সমবায়ে একটি সার্বভৌম মুসলিম জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

"পাকিস্তানের অন্যান্য এলাকা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের প্রশ্নই ওঠে না। ভারতের মুসলমানেরা একটিমাত্র সুসংহত জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সকল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের সমবায়ে একটি মাত্র সুসংহত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

"বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন প্রতিরোধ করার জন্য (প্রস্তাবিত) পাকিস্তান রাষ্ট্রে অন্যান্য এলাকার সঙ্গে বাংলার কোন সম্পর্ক নাই বলে ঘোষণা করা উচিত—আমি এ মতের তীব্র নিন্দা করি। এই ধরনের কোন নীতি গ্রহণ করা হলে পরিনামে তা আত্মঘাতী বলে প্রতিপন্ন হবে। তার একটা আশু ফল এই হবে যে, আমাদের উপর নির্ভরশীল ও আস্থাস্থাপনকারী মুসলিম আসাম হতোদ্যম ও রাজনৈতিকভাবে খতম হয়ে যাবে।

"যাঁরা হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত বাঙালী জাতির কথা বলেন এবং সেই ভিত্তিতে স্বতন্ত্র সার্বভৌম বাংলার আওয়াজ তোলেন তাঁরা

নিজেদেরকে আমাদের সেই শত্রুদের ক্রীড়নকে পরিণত করছেন যাঁরা পূর্ব ও পশ্চিমে হিন্দু প্রদেশের মাঝখানে ফেলে মুসলিম বাংলাকে পিষে মারার কথা খোলাখুলি বলছে।"

ফরিদপুরে বাংলা লীগ কাউন্সিল বৈঠক

সেদিনের আর এক খবরে বলা হয় যে, ফরিদপুরে ৩১শে মে ও ১লা জুন বাংলা লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছে। অধিবেশনে 'বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি,' আলোচনা করা হবে এবং 'এই অধিবেশনে বাংলার ভবিষ্যৎ গঠন কাঠামো সম্পর্কে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে।'

হিন্দু সাম্প্রদায়িক পত্র-পত্রিকার বিরুদ্ধে সোহরাওয়ার্দীর ব্যবস্থা গ্রহণ

এদিকে কলকাতার হিন্দু সংবাদপত্রগুলি জনাব সোহরাওয়ার্দীর উপর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে এবং সেটাও ঠিক তখন যখন জনাব সোহরাওয়ার্দী শুধু বর্তমানের সাময়িক প্রয়োজনেই নয় বরং দূরায়ত ভবিষ্যতের জন্যও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের প্রচেষ্টায় সর্বাত্মকভাবে নিরত। দাঙ্গা উপদ্রুত শহরে এই সব পত্র-পত্রিকার প্রচারণা বিশেষ উপদ্রবের কারণ হয়ে উঠেছিলো, আর তাই সরকার বেশ কয়েকটি হিন্দু পত্রিকার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হন। জনাব সোহরাওয়ার্দী কস্মিনকালেও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধে বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু জনগণের এক অংশের জান ও মালের উপর ক্রম-বর্ধমান বিপদ ঘনিয়ে আনার প্রেক্ষিতে অপ্রীতিকর কিন্তু অপরিহার্য প্রয়োজনের তাগিদেই সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে আদালতের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হতে হয়। ৭ই মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকেই পাঠকেরা অনুমান করতে পারবেন

কলকাতার তৎকালীন হিন্দু পত্রিকাগুলো সমাজ-বিরোধী ও বিদ্বেষ-দুষ্ট প্রকাশনায় কতখানি তৎপর ছিল এবং জনাব সোহরাওয়ার্দী কিভাবে তাদের মোকাবেলা করেন। সংবাদটিতে বলা হয় :

''আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের সাবেক জামানত বাংলা সরকার কর্তৃক ব্যাজেয়াফ্ত করায়, উক্ত দুইটি পত্রিকার মুদ্রাকর-প্রকাশকেরা মঙ্গলবার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যথাক্রমে ৬,০০০ ও ৫,০০০ টাকা নতুন জামানত জমা দেন এবং নতুন করে স্ব স্ব পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসেবে 'ডিক্লেয়ারেশন লাভ করেন।

''অমৃতবাজার পত্রিকা প্রেসের রক্ষক যুগান্তরে 'কোলকাতা ছাড়ো' শীর্ষক একটি আপত্তিকর নিবন্ধ প্রকাশ করার জন্যে ৪,০০০ টাকার নতুন জামানত জমা দেন।

''দৈনিক হিন্দুস্তান-এ ২২শে ডিসেম্বর এবং দৈনিক স্বাধীনতার ১৪ই ডিসেম্বর তারিখের সংখ্যায় কথিত দুইটি আপত্তিকর নিবন্ধ প্রকাশ করার দায়ে দৈনিক হিন্দুস্থানের সম্পাদক মিঃ রমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি ও দৈনিক স্বাধীনতার সম্পাদক মিঃ রমনী মোহন সরকার এবং পত্রিকা দুইটির মুদ্রাকর ও প্রকাশককে কোলকাতার বিশেষ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আর, ডেভিডসনের আদালতে ১৯৪৬ সালের বেঙ্গল স্পেশাল পাওয়ার অর্ডিন্যান্স বলে অভিযুক্ত করা হয়।

লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বিভাগ প্রশ্ন আলোচনা

৯ই মে বাংলা মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এক বৈঠকে মিলিত হন এবং বিভাগ প্রশ্ন আলোচনা করেন। বৈঠকের বিস্তৃত বিবরণ প্রদানকারী এক প্রেস রিপোর্টে বলা হয় :

''প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অফিসে মঙ্গলবার সকালে বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির তিন ঘন্টা ব্যাপী এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বর্ণ হিন্দুদের একটি শ্রেণী কর্তৃক

পরিচালিত বিভাগ আন্দোলনের বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরাম খাঁ এতে সভাপতিত্ব করেন। এতে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, জনাব তমিজুদ্দীন খান, হাবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী, ইউসুফ আলী চৌধুরী, গিয়াসুদ্দীন পাঠান, হামিদুল হক চৌধুরী, মফিজুদ্দীন আহমদ, আবদুল্লাহ আল মাহমুদ এবং জনাব জসিমুদ্দিন আহমদ।

"বাংলার ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র সম্পর্কে হিন্দু নেতাদের সাথে আলোচনা চালানোর জন্যে গঠিত সাব-কমিটিও এই মত প্রকাশ করেছে বলে জানা গেছে যে, বাংলা প্রদেশের মত প্রদেশে বিভাগ আন্দোলন সফল হতে পারে না। জানা গেছে যে, বিভাগের প্রশ্নটি নিয়ে হিন্দু নেতাদের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখার ব্যাপারেও সাব-কমিটিকে প্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। জনাব তমিজুদ্দীন খান, এম, এল-একে (কেন্দ্রীয়) সাব-কমিটির সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করা হয়েছে।

"১৩ই মে মঙ্গলবার সকাল ৯ টায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অফিসে পুনরায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।"

নিষ্পত্তি আলোচনা

"বাংলার কতিপয় কংগ্রেস এবং লীগ নেতা বাংলা বিভাগ সমস্যার একটি সমাধান বের করার জন্যে আলোচনা চালাচ্ছেন। জানা গেছে যে, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে ইতিমধ্যেই কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং আলোচনা এখনো অব্যাহত রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে।"

"সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী শাসনতন্ত্রসহ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা আলোচনার বিষয়বস্তু হবে বলে জানা গেছে।

"বাংলা কংগ্রেস এবং লীগ নেতাগণ কর্তৃক গৃহীত যে কোনো সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র মিঃ গান্ধী এবং মিঃ জিন্নাহর অনুমোদন লাভের পরই চূড়ান্ত করা হবে। বাংলার রাজনীতির এই সাম্প্রতিক মোড়ই মিঃ গান্ধীর বর্তমান বাংলা সফরের কারণ বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে।

মর্ণিং নিউজের আকস্মিক মত পরিবর্তন

১১ই মে তারিখে মর্ণিং নিউজ তার 'সার্বভৌম বাংলা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ঘোষণা করে যে:

"আমরা এটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই যে, মুসলিম বাংলা এক ইঞ্চি ভূমিও ছেড়ে দেবে না। আন্তর্জাতিক আইন এবং নৈতিকতার সকল সূত্র অনুসারে বাংলা আমাদের। মুসলিম জাতির অবশ্যই একটি নিজস্ব আবাস ভূমি থাকতে হবে। কাজেই, বাজারের প্রচলিত গুজব অনুযায়ী হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে আলাপ আলোচনায়রত মুসলিম বাংলার নেতৃবৃন্দকে আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, সাময়িক লাভা-লাভের জন্য জাতির স্বার্থ সমূহ বিনিময় করার কোনো অধিকার তাঁদের নেই। কেননা এই লাভ ভবিষ্যতে মুসলিম জাতির জন্যে ডেকে আনবে এক দুঃখজনক পরিণতি।

"মওলানা আকরাম খাঁ প্রদেশের বাইরে বসবাসকারী আমাদের জনগণকে এই আশ্বাস প্রদান করে যথোচিত কাজ করেছেন যে, পাকিস্তানের অপর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র বাংলার প্রশ্নই ওঠেনা। ভারতের মুসলমানরা একটি একক সংঘবদ্ধ জাতি এবং আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন একটি ঐক্যবদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যা সকল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশকে অন্তর্ভুক্ত করবে।' একথা সত্য যে, লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তানের প্রদেশসমূহকে সার্বভৌম ও স্বায়ত্ব-শাসিতের মর্যাদা প্রদান করেছে, কিন্তু তা করা হয়েছে পাকিস্তান কমনওয়েলথের মধ্যে।"

"যাই হোক, যদি তারা কোনো কারণে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা থেকে হিজরত করতে চায়, যা তারাই ভাল জানে, তবে তারা তা করার ব্যাপারে স্বাধীন। বস্তুত, কায়েদে আজমই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাংলার মুসলমানদের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত প্রদানে সক্ষম, তিনি ইতিমধ্যেই এই সমস্যার একটি সমাধান হিসেবে জনসংখ্যা বিনিময়ের প্রস্তাব করেছেন।"

গান্ধী এবং শরৎ বসুর সাথে হাশিমের সাক্ষাত

১১ই মে তারিখে সংবাদপত্রের রিপোর্টে বলা হয় যে, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারী জনাব আবুল হাশিম যোদপুর আশ্রমে মিঃ গান্ধীর সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আলোচনায় শরৎ বসুও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সামনে উত্থাপিত কঠিন প্রশ্ন ছিলো, বাংলা বিভাগের পক্ষে ক্রমবর্ধমান হিন্দু জনমতের প্রেক্ষিতেও কি বিভাগ এড়ানো যাবে? মিঃ গান্ধী হিন্দু জনমতের শক্তি স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি প্রতিবাদের ভয় না করেই বলতে পারতেন, 'যদি বিভাগ হয়েই যায় তবে মুসলিম সংখ্যাগুরুরাই সে জন্যে দায়ী হবে এবং এজন্যে আরো বলতে পারতেন যে, মুসলিম সরকার ই তখন ক্ষমতাসীন ছিলো।'

"মিঃ গান্ধী আরো বলেছেন যে, যদি তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকতেন, তবে তিনি তার হিন্দু ভাইদের কাছে আবেদন জানাতেন অতীতকে ভুলে যেতে। তিনি তাদের বলতেন যে, তিনিও তাদের সমানই বাঙালী। ধর্মের পার্থক্য দু'জনকে আলাদা করতে পারে না। তিনি বলেন, 'আমরা এবং তারা একই ভাষায় কথা বলি, আমরা একই সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। বাংলার সব কিছুই উভয়ের নিকট সমান এবং উভয়েই তা নিয়ে সমান গর্বিত হতে পারে। বাংলা বাংলাই ছিলো। তা পাঞ্জাবও ছিলো না, বোম্বেও ছিলো না বা অপর কিছুই ছিলো না।'

"মিঃ গান্ধী আরো বলেন, যদি মুখ্যমন্ত্রী তেমন মনোভাব গ্রহণ করতে পারেন, তবে তিনি তাঁর সাথে স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে হিন্দু শ্রোতাদের বোঝাবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন এবং তিনি স্পষ্ট করে বলেন, তারপর বাংলার ঐক্যের বিরোধিতাকারী কোনো হিন্দু থাকবে না, কারণ বাংলার এই ঐক্যের জন্যে

হিন্দু ও মুসলমানরা এত বীরত্বের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করেছেন যে, তারা লর্ড কার্জনের মত শক্তিশালী ভাইসরয়ের 'নিষ্পত্তিকৃত বিষয়'কেও পাল্টে দিয়েছে। তিনি সৌহার্দ্য ও প্রীতিপূর্ণ সার্বভৌম শাসনের ওপর বিশ্বাস করেন, যা বর্ণ, গোত্র বা সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করে না।

গান্ধীর সাথে সোহরাওয়ার্দীর আলোচনা

১২ই মে মর্ণিং নিউজে দুই কলাম শিরোনামায় প্রথম পৃষ্ঠার একটি সংবাদে বলা হয়ঃ

"বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী রোববার বিকেলে যোদপুর আশ্রমে মিঃ গান্ধীর সাথে ৯০ মিনিটব্যাপী এক আলোচনায় মিলিত হন।

'জানা গেছে যে, একটি যুক্ত এবং সার্বভৌম বাংলার সম্ভাব্যতা এবং কাম্যতার প্রশ্ন আলোচিত হয়। জনাব সোহরাওয়ার্দী মিঃ গান্ধীর সামনে ভবিষ্যত যুক্ত বাংলার একটি ছবি উপস্থাপিত করেন। আজ তিনি আবার মিঃ গান্ধীর সাথে মিলিত হবেন। বাংলার রাজস্ব মন্ত্রী জনাব হাবীবুর রহমানও এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন।

'আলোচনার পর জনাব সোহরাওয়ার্দী সাংবাদিকদের বলেন যে, "আমি মিঃ গান্ধীর সামনে আমার দৃষ্টিতে ভবিষ্যত যুক্ত বাংলার একটি ছবি উপস্থাপিত করি। আমি মনে করি যে, যদি বাংলা বিভাগ করা হয়, তবে তা প্রত্যেকের জন্যেই মারাত্মক ক্ষতিকর হবে। তাই সকল শ্রেণীর মানুষকে বাংলাকে রক্ষা করার জন্যে অবশ্যই সহযোগিতা করতে হবে। যদি ভবিষ্যত বাংলা আমার হাতে থাকে, তবে বাংলা যাতে সমৃদ্ধিশালী এবং মহান দেশে পরিণত হয়, তা দেখা আমার কর্তব্য। আমি কোনো মূল্যেই বিভাগ চাই না। আমি কখনো বাংলা বিভাগের কোনো পরিকল্পনায় কোনো পক্ষ হবো না এবং এর জন্যে কোনো কাজ করবো না।"

জনাব সোহরাওয়ার্দী আরো বলেন, "যদি হিন্দুরা আমার কথা শুনতে প্রস্তুত থাকে, তবে আমি তাদের কাছে যেতে এবং তাদের সাথে আলাপ করতে প্রস্তুত।" আমি অনুভব করি যে, "দুর্ভাগ্যবশত সন্দেহ এতো দানা বেঁধে উঠেছে যে, এমন কি একটি মামুলি কাজকেও ভুল বোঝা হয়ে থাকে। কতিপয় সংবাদপত্র এই সন্দেহ বিস্তার করছে এবং ক্রমাগতভাবে সত্যকে বিকৃত করার চেষ্টা করছে। এমন কি তা সত্বেও আমি তাদের কাছে যেতে প্রস্তুত। একদিন সন্দেহের এই মারাত্মক দেয়াল ধ্বংস হয়ে যাবে। হিন্দুদের অবশ্যই প্রতিদান প্রদানে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং একটি সমঝোতার মধ্যে আসতে হবে।"

জনাব নূরুল আমীন কর্তৃক সাব-কমিটির কার্যাবলী ব্যাখ্যা

১৩ই মে জনাব নূরুল আমীন সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রদান করেন এবং তাতে 'ঐক্যবদ্ধ বাংলা'র প্রশ্নে হিন্দু নেতাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্যে বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাব-কমিটি কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যাদির সম্পর্কে তার ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

তিনি এক সাক্ষাতকারে 'মর্ণিং নিউজ'কে বলেন যে, "সাব-কমিটির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলার ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র সম্পর্কে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে একটি সাধারণ ভিত্তির সম্ভাব্যতা পুংখ্যানুপুংখরূপে পরীক্ষা করা। সাব-কমিটি হিন্দু নেতাদের সাথে তাদের আলোচনার ফলাফল বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সামনে পেশ করবে।

"বাংলা মুসলিম লীগ প্রস্তাবসমূহ আলোচনা ও সংশোধনের পর তা নিখিল ভারত মুসলিম লীগ হাই কমাণ্ডের কাছে পেশ করবে এবং এ ব্যাপারে হাই কমাণ্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।"

গান্ধীর সাথে সোহরাওয়ার্দীর সাক্ষাত

একই দিনে জনাব সোহরাওয়ার্দী পুনরায় যোদপুর আশ্রমে গান্ধীর সাথে সাক্ষাত করেন। অর্থমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী এবং বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারী জনাব আবুল হাশিমও আলোচনা কালে উপস্থিত ছিলেন।

দিল্লীতে জনাব সোহরাওয়ার্দী

১৪ই মে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী নয়াদিল্লী পৌঁছান। সংবাদপত্রের রিপোর্টে বলা হয়ঃ 'বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, যিনি একটি রাজনৈতিক মিশন নিয়ে এখানে এসেছেন বলে মনে করা হচ্ছে, আগামীকাল (১৫ই মে) ভাইসরয় এবং মিঃ জিন্নাহর সাথে প্রদেশ বিভাগের প্রশ্নে উত্থাপিত দাবীর ব্যাপারে আলোচনা করবেন। জনাব সোহরাওয়ার্দী, যিনি প্রদেশের যে কোনো পর্যায়ের বিভাগের ব্যাপারে তাঁর বিরোধিতার কথা ঘোষণা করেছেন এবং একটি সংযুক্ত সার্বভৌম বাংলার প্রস্তাবের উত্থাপন করেছেন, দিল্লী যাত্রার প্রাক্কালে তিনি মিঃ গান্ধী এবং বাংলা কংগ্রেসের আরো কতিপয় নেতার সাথে কয়েকবার সাক্ষাত করেছেন।

"জানা গেছে যে, জনাব সোহরাওয়ার্দী তার সাথে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আলোচনার আলোকে মিঃ জিন্নাহর সাথে সমগ্র পরিস্থিতি আলোচনা করবেন। অনুমান করা হচ্ছে যে, লীগ হাই কমাণ্ডের বিবেচনার জন্যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কতিপয় প্রস্তাব আনয়ন করেছেন।"

রাইফেল ক্লাব স্থাপনের জন্যে টেণ্ডনের আহ্বান

এর দু' দিন আগে ১২ই মে ইউ, পি পরিষদের স্পীকার মিঃ পুরুষোত্তম দাস টেণ্ডন এক বিবৃতিতে 'গুণ্ডামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে শীগগিরই রাইফেল ক্লাব এবং শরীর চর্চা কেন্দ্র স্থাপন

এবং প্রত্যেক জেলায় কমপক্ষে ৫,০০০ যুবক সমন্বয়ে একটি বাহিনী গড়ে তোলার জন্যে প্রত্যেক কংগ্রেস কমিটির প্রতি আহ্বান জানান। ঝাঁসিতে কংগ্রেস শিক্ষা শিবিরে বক্তৃতাদানকালে তিনি বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি আত্মরক্ষার জন্যে ইউ, পি, সরকার অবশ্যই জনগণকে উদারভাবে অস্ত্র প্রদান করবে।'

বাংলা বিভাগ উদ্যোগ সম্পর্কে জনাব লিয়াকত আলী খান

১৩ই মে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী লিয়াকত আলী খান বাংলা এবং পাঞ্জাব বিভাগের উদ্যোগের ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া প্রদান করেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন: "এই দুইটি প্রদেশের বিভাগের ব্যাপারে যে যুক্তি উত্থাপন করা হচ্ছে, তা এই যে, এই প্রদেশদ্বয়ের সংখ্যালঘুরা আশঙ্কা করছে যে, এই প্রদেশদ্বয়ের সরকারের কাছ থেকে তারা ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার পাবেন না। যদি উপরোক্ত বক্তব্যকে যুক্তি গ্রাহ্য বলে বিবেচনা করা হয়, তা'হলে সকল হিন্দু প্রদেশকে বিভক্ত করতে হবে এবং প্রত্যেক প্রদেশে মুসলিম সংখ্যালঘুদের জন্যে একটি নিরাপদ স্থান খুঁজে বের করতে হবে, কারণ অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে মুসলমানরা হিন্দুদের চাইতে অধিক শঙ্কিত হওয়ার কারণ রয়েছে।"

তিনি আরো বলেন: "নৈতিক বা অপর কোনো কারণেই বিভাগকে ন্যায়সঙ্গত করা যায় না এবং মুসলমানরা কখনোই তাতে সম্মত হবে না। যদি তেমন বিভাগ করা হয় তবে তা হবে হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তানের মধ্যে ভবিষ্যত গোলযোগ ও চিরস্থায়ী তিক্ততার বীজ বপনের সামিল।

জনাব মাহমুদ নূরুল হুদাও মুখ খুললেন

একই দিনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য ও জনাব আকরাম খাঁ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত মাহমুদ নূরুল হুদা জনাব আবুল

হাশিমের ওপর তীব্র আক্রমণ চালান এবং হিন্দু নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনা চালানোর ব্যাপারে তার প্রাধিকারকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং একে পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমানদের স্বার্থের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে অভিহিত করেন। জনাব হুদা বলেন: 'তিনি (আবুল হাশিম) হিন্দু নেতাদের সাথে এমনভাবে আলোচনা চালাচ্ছেন যেন তিনিই মুসলিম বাংলার একক স্বীকৃত নেতা। অত্যন্ত কুখ্যাত স্থানে অবস্থিত গুয়েনা হাউসে শরৎচন্দ্র বসুর সাথে তাঁর বৈঠক এবং কয়েক মাস পূর্বে তাঁর সন্দেহজনক টেলিফোন আলাপ মুসলমানদের মনে নিদারুণ সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিল অব এ্যাকশন-এর সদস্য খাজা নাজিমুদ্দীন এবং বাংলা মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরাম খাঁর সাথে সাক্ষাত করার মতো সৌজন্যতাবোধও তিনি দেখান নি। তিনি ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র সম্পর্কে অমুসলিমদের সাথে আলোচনা চালানোর জন্যে প্রাদেশিক লীগ কর্তৃক নিযুক্ত কমিটির সদস্য নন।'

জনাব নূরুল হুদা আরও বলেন যে, ''যোদপুরে নাচের আসরে অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই জানা উচিত যে, দুই নিমজ্জমান জাহাজ (জনাব হাশিম এবং সোহরাওয়ার্দীর প্রতি ইঙ্গিত) কর্তৃক অর্পিত সামগ্রী বাংলাদেশে কোনো বাজার পাবে না এবং সাধুর আশির্বাদও কোনো কাজে লাগবে না।''

একটি যুক্তি !

১৪ই মে মর্ণিং নিউজ 'আজকের বাংলা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলেন যে, শরৎ বসুর ফরমূলা অনুসারে, যখন আইন পরিষদ গঠিত হবে তখন 'নতুন সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র যে কোনো ফেডারেশনে যোগদানের ব্যাপারে স্বাধীন হবে।' পত্রিকায় প্রশ্ন তোলা হয়, 'যদি নতুন সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্রকে অখণ্ড ভারতের

কাছে আত্মসমর্পণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে বলপ্রয়োগ করা হয়, তা'হলে কি হবে? বাঙালী হিন্দুদের কোনো কিছুই হারাতে হবে না।

একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ সম্পর্কে কি চমৎকার যুক্তি!

বেরারের পক্ষে মর্ণিং নিউজ

একই পত্রিকার ১৪ই মে প্রকাশিত 'হায়দরাবাদ' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে হায়দরাবাদের সাথে বেরার-এর অন্তর্ভুক্তির পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। মর্ণিং নিউজের সম্পাদকীয়তে বলা হয়: 'বেরার হায়দরাবাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং একে অবশ্যই নিজামের নিকট ফেরত যেতে হবে, যেমন করে বৃটিশ রাজের অবসানের সাথে সাথে জম্মু ও কাশ্মীরে ডোগরা রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটবে। বেরারের ওপর নিজামের সার্বভৌমত্ব ইতিমধ্যেই সরকারীভাবে স্বীকার করা হয়েছে। তার সরকারী পদবী হচ্ছে হায়দরাবাদ এবং বেরারের নিজাম এবং তার পতাকা আজো বেরারে উড্ডীন রয়েছে।

''হায়দরাবাদের দৃশ্যত উত্তরাধিকারীর মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে বেরারের যুবরাজ হিসেবে। হায়দরাবাদ কনটিনজেন্টের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্যে নিজামের সাথে কৃত অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের অংশ হিসেবে বেরার বৃটিশের কাছে ইজারা প্রদান করা হয়। ১৯০৩ সালের চুক্তি অনুসারে নিজাম বেরার থেকে বার্ষিক ২৫ লাখ টাকা আয় পান। কংগ্রেসী ও মহাসভাপন্থীরা এই সুস্পষ্ট বিষয়সমূহ এড়িয়ে যাওয়ার যত চেষ্টাই করুন না কেনো, তাদের এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা উচিত যে, মুসলিম ভারত হায়দরাবাদ নিয়ে কোনো বাঁদরামী কখনো বরদাশত করবে না। হায়দরাবাদের ব্যাপারে নাক গলিয়ে হিন্দুরা আগুন নিয়ে খেলছে।'

ইতিহাস প্রমাণ করেছে, ন্যায্য পাওনা থেকে কিভাবে আমরা প্রতারিত এবং বঞ্চিত হয়েছি এবং আমরা কিভাবেই বা হারিয়েছি হায়দরাবাদ। বেরার-এর কথা না হয় নাই বললাম।

মিঃ জিন্নাহর সাথে সোহরাওয়ার্দীর সাক্ষাত

১৫ই মে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী তার রাজস্ব মন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমানকে সাথে নিয়ে মিঃ জিন্নাহ্র সাথে সাক্ষাত করেন। এই সাক্ষাতের খবর দিতে গিয়ে কলকাতার সংবাদপত্রে বলা হয় যে, সোহরাওয়ার্দী তাঁর প্রদেশের অবস্থা সম্পর্কে মিঃ জিন্নাহকে অবহিত করেন। রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, বাংলা বিভাগ রোধে তাঁর উদ্যোগ ব্যর্থ হলে বাংলার রাজনীতি থেকে জনাব সোহরাওয়ার্দী অবসর গ্রহণ করতে পারেন বলে জানা গেছে। মুসলিম লীগের পত্রিকায় এই খবর অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয় এবং আরো বলা হয় যে, দিল্লীর রাজনৈতিক মহলের বিশ্বাস যে, হায়দরাবাদের নিজাম ইতিমধ্যেই তাঁকে তাঁর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছেন।

রিপোর্টে আরো বলা হয়, জনাব সোহরাওয়ার্দী, যিনি লীগ হাই কমাণ্ডের কাছে প্রদেশের বিভাগ রোধের ব্যাপারে বাংলার হিন্দুদের সাথে একটি চুক্তির জন্যে তার চূড়ান্ত আপোষ ফর্মূলা পেশ করেছেন, বাংলার বিভাগ রোধে তাঁর আন্তরিক ইচ্ছার কথা লীগ হাই কমাণ্ডের কাছে ব্যক্ত করেছেন বলেও জানা গেছে, যা করতে ব্যর্থ হলে তিনি বাংলার রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করতে পারেন।'

কলকাতার মুসলিম লীগ সংবাদ-পত্রসমূহ কর্তৃক এই খবর যেভাবে পরিবেশন করা হয়েছে, তা সোহরাওয়ার্দীকে যারা চিনতেন তারা অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চিত্তে গ্রহণ করেন।

মর্ণিং নিউজ বলেন—'বিপদজনক উদ্যোগ'

একই দিনে মর্ণিং নিউজ, যা মাত্র পক্ষকাল আগে প্রকাশ করেছিলো যে, 'বিবেকহীন বা দূরদৃষ্টিহীন অসৎ ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউই বিবৃতিতে (অর্থাৎ যুক্ত স্বাধীন বাংলার পক্ষে

সোহরাওয়ার্দীর বিবৃতি) উত্থাপিত বিষয়ে দ্বিমত করতে পারে না',
'বিপদজনক উদ্যোগ' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে :

পুঁচকে ব্যক্তিরা যারা 'পাকিস্তান জাতীয় রাষ্ট্রের সাথে কোনোরূপ সম্পর্কহীন সার্বভৌম বাংলার' কথা বলে, তারা জানেনা তারা কি বলছে। তেমন বালসুলভ বক্তব্য দ্বারা তারা হয় নিজেদের বা জনগণকে প্রতারণা করছে এবং এর মাধ্যমে তারা স্পষ্টতঃ নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্বেরই বিনাশ সাধন করছে। আমাদের মধ্যেকার অন্তর্ঘাতি কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তি বা কুইসলিংদের মুসলিম ভারত কখনো সহানুভূতির সাথে গ্রহণ করবে না - - - - - আমরা আমাদের সকল শক্তি দ্বারা আমাদের ভৌগলিক অঞ্চলের বিভাজন রোধ করবো। ভবিষ্যতে ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, যদি বৃটিশ সরকার রাজকীয় কারণে বাংলা এবং পাঞ্জাবের অঙ্গচ্ছেদ করে। বৃটিশের ভারত ত্যাগের পর একটা মাত্র পথই অবশিষ্ট থাকবে এবং তা হচেছ যুদ্ধ—আমাদের পাকিস্তান জাতীয় রাষ্ট্র থেকে যে সব এলাকা কেটে রাখা হবে তা পুনঃসংযুক্তির যুদ্ধ।'

হিন্দু—মুসলিম আলোচনা প্রসঙ্গে বাহার

১৪ই মে বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত জেনারেল সেক্রেটারী জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী এম, এল, এ 'বাংলায় হিন্দু-মুসলিম মতবিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে প্রচারিত উদ্যোগের ব্যাপারে মুসলিম লীগের ভূমিকা সুস্পষ্ট করার জন্যে" এক বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি বলেন: 'সকল আলোচনাকে সংহত এবং ব্যক্তিগতভাবে চালানো অননুমোদিত আলোচনাসমূহ, বন্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি মওলানা আকরাম খাঁর সভাপতিত্বে এবং জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দীর উপস্থিতিতে সম্প্রতি বাংলার ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র

সম্পর্কে হিন্দু নেতাদের সাথে আলোচনা চালানোর জন্যে একটি কমিটি নিযুক্ত করেছে। এই কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো ব্যক্তিকে, তিনি যত উচচ পদেই আসীন থাকুন না কেনো, এই জটিল প্রশ্নে কারো সাথে আলোচনা চালানো বা কোনো ওয়াদা করার অনুমতি প্রদান না করা।

'জনাব বাহার আরো বলেন যে, তিনি ৩১শে মে কলকাতায় ওয়ার্কিং কমিটির একটি বৈঠক ডেকেছেন। এই সভায় এই বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে। এর মধ্যে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নিযুক্ত কমিটির সাথে বিষয়টি আলোচনার উদ্দেশ্যে হিন্দু নেতাদের জন্যে দ্বার উন্মুক্ত থাকবে।'

জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব

১৩ই মে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ 'ভারতীয় মুসলমানদের সম্মুখে উপস্থিত মারাত্মক সমস্যা সমূহ' বিবেচনার জন্যে জমিয়ত ও মুসলিম লীগের গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব করে।

জমিয়তের সেক্রেটারী মওলানা হাফিজুর রহমান এক সাক্ষাতকারে বলেন: 'যদি ভারত বিভক্তি অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করা হয়, তবে বাংলা এবং পাঞ্জাব প্রদেশকে পূর্ণ সার্বভৌমত্ব প্রদান করতে হবে। পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়ার পর এই প্রদেশদ্বয় নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা ঠিক করবে। তিনি আরো বলেন: 'যদি আমরা লীগের সাথে কোনো আপোষ রফায় পৌঁছুতে পারি এবং যদি আমরা নিশ্চিত হই যে, কংগ্রেসের সাথে আমাদের থাকার ফলে মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তবে আমরা সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণে ব্যর্থ হবো না।'

আকরাম খাঁর 'অনধিকার প্রবেশ' আশঙ্কা

১৫ই মে বাংলা মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরাম খাঁ এক বিবৃতিতে বলেন: 'বাংলার ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র সম্পর্কে শরৎ বসুর ফর্মূলা বাঙালী মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে চিরতরে কবরস্থ করার ষড়যন্ত্র প্রসূত। তা গ্রহণ করা পাকিস্তান পরিকল্পনার প্রতি মরণাঘাতের এবং বাংলার তিন কোটি পাঁচ লাখ মুসলমানকে বর্ণ হিন্দুদের হাতে অর্পণ করার শামিল হবে। এই ফর্মূলার পিছনে বর্ণ হিন্দুদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো ভাবে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া এবং মন্ত্রিসভায় অনধিকার প্রবেশ করা এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদ দখল করা, যাতে করে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় সমগ্র প্রশাসন যন্ত্রের ওপর তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে।'

মওলানা সাহেব আরো বলেন: 'আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি মুসলিম বাংলা পাকিস্তান পরিকল্পনার প্রতি অন্তর্ঘাতি হবে এমন যে কোনো পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা করবে এবং যদি এই ফর্মূলার ওপর ভোট গ্রহণ করা হয় তবে শতকরা ৫ ভাগ মুসলমানও তা সমর্থন করবে না।'

একটি পৃথক মিশন—

১৬ই মে মওলানা আকরাম খাঁ, জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী, জনাব নূরুল আমীন এবং জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী 'বাংলার ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র' সম্পর্কে আলোচনার জন্যে নয়াদিল্লী পৌঁছান। তাঁরা মিঃ জিন্নাহ এবং লীগ হাই কমাণ্ডের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলার বিষয়ে ১৮ই মে এক ঘণ্টা ব্যাপী আলোচনা করেন।

জনাব সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে

১৭ই মে কলকাতার মুসলিম লীগ-এর দৈনিক সমূহ নয়াদিল্লীর সান্ধ্য দৈনিক 'ন্যাশনাল কল'-এর একটি খবর পুনর্মুদ্রণ করে। এই

রিপোর্টটি উদ্দেশ্যহীন ছিলো না। এতে বলা হয়ঃ 'বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে জানা গেছে যে, মিঃ জিন্নাহর সাথে তাঁর আলাপ সন্তোষজনক হয় নি। সান্ধ্য দৈনিক 'ন্যাশনাল কল'-এর বিশেষ প্রতিনিধি এ খবর প্রদান করেছেন।'

'সংবাদদাতা আরো বলেনঃ এ কথা বিশ্বাস করা হচ্ছে যে, যুক্ত নির্বাচনের মূলনীতির ওপর ভিত্তিশীল বাংলায় এমন কোনো বন্দোবস্তের ব্যাপারে মিঃ জিন্নাহ তাঁর পূর্ণ এবং আপোষহীন অনুমোদনের কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি, মিঃ সোহরাওয়ার্দী, মিঃ গান্ধী এবং বাংলার অন্যান্য অমুসলিম নেতার সাথে যেভাবে একতরফা আলোচনা চালিয়েছেন, তাও অপছন্দ করার কথা এবং কায়েদে আজম প্রদর্শিত পন্থায় যেহেতু সোহরাওয়ার্দী আর পাকিস্তান আন্দোলন পরিচালনায় ইচ্ছুক নন তাই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীত্বের পদ থেকে পদত্যাগ করে অন্য কারো জন্যে পদ শূন্য করে দেয়া তাঁর উচিত বলেও মিঃ জিন্নাহ মত প্রকাশ করেছেন বলে বিশ্বাস (?) করা হচ্ছে।'

রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে উর্দুর জন্যে খালেকুজ্জামানের ওকালতি

১৮ই মে মজলিসে ইত্তেহাদুল মুসলেমিন-এর উদ্যোগে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত উর্দু সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে চৌধুরী খালেকুজ্জামান তাঁর শ্রোতাদের আশ্বাস প্রদান করেন যে, পাকিস্তানে উর্দু রাষ্ট্র ভাষা হবে।

চট্টগ্রামের প্রতিক্রিয়া ?

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই গুরুত্বপূর্ণ মাসগুলোতে সবকিছুই দলীয় পর্যায়েই আলোচিত হতো এবং সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো এবং এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সঞ্জাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও প্রধানত সীমিত ছিলো রাজনৈতিক মহল সমূহে। জনমত নির্ধারণ বা জনগণের

প্রতিক্রিয়া যাচাই করার জন্যে জনসভার অনুষ্ঠান কৃচিৎই করা হতো। সে যাই হোক, ২০শে মে মর্ণিং নিউজ 'জনৈক সংবাদদাতা'র বরাত দিয়ে চট্টগ্রামের প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত একটি ছোট্ট খবর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেন। এই সংবাদদাতাটি কে বা তাঁর জনমত মূল্যায়নের ভিত্তি কি ছিলো তা কারোরই জানা ছিলো না। 'পাকিস্তান ইস্যুর ব্যাপারে কোন আপোষ নাই: জনাব হাশিমের প্রস্তাব বর্জন'' এই শীর্ষক খবরটিতে বলা হয়: 'চট্টগ্রামের ১৮ লাখ মুসলমান জনাব আবুল হাশিমের ১৬ই মে তারিখের বিবৃতি প্রত্যাখ্যান করেছেন। পাকিস্তান ইস্যুতে কোনরকম আপোষ করা চলবে না, এই হচ্ছে এখানকার মুসলিম জনতার ঐকতান। সার্বভৌম বাংলার কথায় প্রতারিত হতে তাঁরা আদৌ রাজী নন। তাঁদের মতে বাংলা অবিশ্যিই পাকিস্তানের অংগ হতে হবে, কেননা পাকিস্তান ছাড়া মুসলমানরা বেঁচে থাকতে পারবেনা।'

আকরাম খাঁ লাহোর-প্রস্তাব ছাড়া আর কোন পরিকল্পনার কথা জানেন না

১৯শে মে মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ এক বিবৃতিতে বলেন: 'মুসলিম বাংলা নিশ্চিতভাবে বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে। আমি এ প্রশ্নের সংগে সংশ্লিষ্ট সকলকে আশ্বাস দিতে পারি যে, মুসলিম বাংলা লৌহ-দৃঢ় ঐক্যের সাথে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে।' ওরিয়েন্ট প্রেসকে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই উক্তি করেন।

তিনি ঘোষণা করেন: 'মুসলিম বাংলার মৃতদেহের উপরই শুধু বাংলাকে বিভাগ করা যাবে। তবে, আমরা প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্যে গ্রহণ করতে পারি এই শর্তে যে, হিন্দু প্রধান প্রদেশগুলির অভ্যন্তরে যেখানেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা আছে সেখানেই এই প্রস্তাবের উদ্দিষ্ট কার্যক্রম নীতিগতভাবে গ্রহণ করা হবে।'

বাংলা মুসলিম লীগের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি প্রশ্নে মওলানা বলেন যে, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে কোন মতদ্বৈধতার অস্তিত্ব নাই।

উপসংহারে মওলানা বলেন: 'অখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবে নির্দেশিত পরিকল্পনার সংগে সামঞ্জস্য নাই এমন কোন প্রস্তাব আমি সমর্থন করবো না।'

তাঁদের "মিশনের প্রতি পদক্ষেপ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে"

জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী, জনাব নূরুল আমীন ও ইউসুফ আলী চৌধুরীর সংগে দিল্লী গিয়েছিলেন। সেই দিনই কলকাতায় ফিরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে, তাঁদের 'মিশনের প্রতি পদক্ষেপ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।'

তিনি বলেন: 'আমাদের মিশনের প্রতি পদক্ষেপ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আমরা এখন পূর্ণতঃ ওয়াকেফহাল হয়েছি আমাদের নানা-মুখী সমস্যা সম্পর্কে কায়েদে আজমের মতামত কি। এখতিয়ার-বহির্ভূত আলাপ-আলোচনার ফলে উদ্ভূত বিভ্রান্তি এখানে তিরোহিত হয়েছে। কায়েদে আজম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমাদের বলেছেন যে, তিনি কাউকেই মুসলিম লীগের পক্ষে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবার এখতিয়ার দেন নাই (এই রকম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কেউই হয়নি অবিশ্যি।) শুধু তাই নয়, তিনি এতদূর পর্যন্ত বলেন যে, স্বয়ং তিনিও ওয়ার্কিং কমিটির পরামর্শ গ্রহণ ব্যতীত কারো সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন না, যদিও তা করার আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা তাঁর আছে।'

জনাব বাহার সাহেব আরো বলেন: 'এটা খুবই দুঃখজনক যে, হিন্দু নেতারা ঘরোয়া আলোচনায় যুক্ত বাংলার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করলেও তাঁদের মনের কথা সাধারণ্যে খুলে বলার সৎসাহস নাই। এই

ভদ্র মহোদয়দের উচিত কালবিলম্ব না করে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবাদি নিয়ে এগিয়ে আসা ও প্রাদেশিক লীগের সংগে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু করা, অবিশ্যি যদি তাঁরা সত্যি বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ ব'লে বিবেচনা করেন।'

জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী বলেন: 'স্ব-নির্বাচিত আলোচনা-কারীরা এখন নিজেদের অবস্থাটা বুঝতে পেরে, দিল্লীর প্রতিক্রিয়ার উত্তরকালীন পরিবর্তিত পরিস্থিতির সংগে নিজেদের সাবেক ভূমিকার সামঞ্জস্যবিধানে যত্নবান হয়েছেন, এটা খুবই আশাব্যঞ্জক। কায়েদে আজমের সংগে আমাদের সাক্ষাৎকারের পর কতিপয় নেতার ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত আলাপ-আলোচনার প্রকৃতি সম্পর্কে আর কোন সংশয়ের অবকাশ থাকছে না। (তাঁদের) কেউই দাবী করতে পারেন না যে, কংগ্রেস বা অন্য কোন সংগঠন কিংবা হিন্দু নেতাদের সংগে আলোচনার বা কোনপ্রকার সমঝোতায় উপনীত হবার উদ্দেশ্যে তিনি লীগ হাই কমাণ্ডের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়েছেন। আলো-চনাধীন শর্তাবলীতে মুসলিম লীগের সমর্থন পাওয়া যাবে ব'লে ধরে নিয়ে অনুরূপ আলোচনা চালিয়ে যাওয়াও কারো পক্ষে আর সম্ভব হবে না।

চৌধুরী সাহেব আরো বলেন: "অবিভক্ত সার্বভৌম বাংলার ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ মীমাংসার জন্যে বাংলা কংগ্রেস নেতারা যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, কংগ্রেস হাইকমাণ্ড তা নাকচ ক'রে দিয়েছেন। এমতাবস্থায়, যদি না বাংলা লীগের মতো বাংলা কংগ্রেসও এই উদ্দেশ্যে কাউকে ক্ষমতা প্রদান করে তাহলে, অনুরূপ আলোচনা চালিয়ে যাওয়া নিরর্থক হবে।'

সমালোচকদের জবাবে জনাব আবুল হাশিমঃ "আমার দাবী লাহোর প্রস্তাবের সংগে সংগতিপূর্ণ"

ইতিপূর্বে ১৭ই মে তারিখে জনাব আবুল হাশিম তাঁর সমালোচকদের জবাব দিয়েছিলেন। জবাবে তিনি বলেনঃ 'বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে আলোচনার একটি সম্ভাব্য ভিত্তি নির্দেশ করার জন্যে আমার এখতিয়ার সম্পর্কে সমালোচকেরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ভালো কাজ করার জন্যে কোন অনুমোদিত এখতিয়ারের প্রয়োজন হয় না। আমার বিবৃতিতে আমি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই সম্বোধন করেছি, কিন্তু কোন সম্প্রদায়েরই মুখপাত্রের ভূমিকা গ্রহণ করিনি।

'আমি জানি আমার দৌড় কতটুকু। বাঙ্গালী মুসলমানদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ কিংবা তাঁদের সকলের প্রতিনিধিত্ব করা তো দূরের কথা, তাঁদের শতকরা ৪ জনের মুখপাত্র হওয়ার মতো শক্তিমান পুরুষ বলেও আমি নিজেকে বিবেচনা করি না। মুসলিম রাজনীতির বর্তমান পর্যায়ে একথা একটি শিশুর কাছেও সুবিদিত যে কায়েদে আজমই একমাত্র ব্যক্তি যিনি বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব বা সিন্ধুর তথা ভারতের সকল মুসলমানের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকারী। আমি জানি বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জনাব সোহরাওয়ার্দী কায়েদে আজমকে বরাবর অবহিত রাখছেন।

পঞ্চাশ ঃ পঞ্চাশ

'দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক অধিকারসমূহের ৫০ ঃ ৫০ (আধাআধি) ভিত্তিতে শরীকানা সম্পর্কে আমি যে সুপারিশ করেছি তা' নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাঁরা নিজেদের সুবিধামত ভুলে যাচ্ছেন যে, ৫০ ঃ ৫০ শরীকানাই হচ্ছে বর্তমানের প্রচলিত নিয়ম; জনাব ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত প্রথম মুসলিম

লীগ মন্ত্রিসভার আমলে হিন্দু ও মুসলমানদের সমঝোতার ভিত্তিতেই এই নিয়ম প্রচলিত হয়।'

জনাব হাশিম আরো বলেন: 'আমার প্রস্তাবিত অবিমিশ্র যুক্ত—নির্বাচন পদ্ধতিতে আইন পরিষদ কিংবা মন্ত্রিসভার আসন বন্টনে ৫০: ৫০ কিংবা ৬০: ৪০ অনুপাতের প্রশ্নই ওঠে না। আমার ৫০: ৫০ অনুপাতের সুপারিশ শুধু চাকুরী ক্ষেত্রে শরীকানার সুবাদে প্রাপ্তব্য রাজনৈতিক সুবিধাদির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্য কোন ক্ষেত্রে নয়।

'আমার কতিপয় মুসলিম সমালোচক এই মত প্রকাশ করেছেন যে, যে মুসলমানেরা বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ, প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিক যুক্ত নির্বাচন প্রথায় তাঁরা নাকি একেবারে লা-পাত্তা হয়ে যাবেন। অনুরূপ নির্বাচন প্রথায় আদৌ যদি কারো কিছু স্বার্থহানি ঘটে তাহলে তা' পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের এবং পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের হিন্দুদের ঘটতে পারে।..

'তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মনে একটা মিথ্যা ত্রাসের সঞ্চার করা হচ্ছে। বাংলার হিন্দু জনসংখ্যার প্রধানতম অংশ হচ্ছেন তাঁরা। যুক্ত নির্বাচন প্রথায় তাঁদের হারাবার কিছুই নাই।

'আলোচনার জন্যে মুসলিম লীগ নিযুক্ত কমিটির ভদ্রমহোদয়গণের প্রতি আমার নিবেদন, আপনারা অযথা আমার মুণ্ডপাত করা ও অবান্তর প্রশ্নে কালক্ষেপ করা ছেড়ে দিয়ে হিন্দু নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনার কাজে অগ্রসর হোন এবং বাংলার ভবিষ্যত নিরূপনে বাস্তবমুখী কর্মপন্থা উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করুন।''

জনাব হাশিম তাঁর প্রস্তাবের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন: 'মুসলিম, ইহুদী, ক্রীশ্চেন প্রভৃতির সমন্বয়ে গঠিত মিশ্র জাতির দেশ হিসেবেও অবিভক্ত সার্বভৌম মিশর যদি একটি পাকিস্তান হতে পারে, অবিভক্ত সার্বভৌম ইরান যদি একটি পাকিস্তান হতে পারে,

তাহলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অবিভক্ত সার্বভৌম বাংলা কি করে অ-পাকিস্তান হতে পারে সে-তত্ত্ব আমার বুদ্ধির অগম্য।

'আমার মাতৃভূমির পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে উত্থাপিত আমার দাবী পূর্ণতঃ ইসলামী আদর্শের অনুগামী এবং লাহোর প্রস্তাবের সংগে সম্পূর্ণরূপে সংগতিপূর্ণ। আমাদের মহানবী (দঃ) এই কথাটি বলে গেছেন বলে জানা যায়—'দেশপ্রেম ঈমানেরই অঙ্গ।'

জনাব ফজলুর রহমান কর্তৃক হিন্দু-মুসলিম আলোচনার পূর্ণ চিত্র উন্মোচন

১৯শে মে জনাব ফজলুর রহমান এক বিবৃতিতে অবিভক্ত সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র প্রশ্নে হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা চলছে তার একটি পূর্ণায়ত চিত্র তুলে ধরেন। তাঁর এই বিবৃতিতে আলোচনা তদবধি যতদূর পর্যন্ত এগিয়েছিলো তার প্রকৃতি সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়। মর্ণিং নিউজ বিবৃতিটি দিনের প্রথম খবর হিসেবে ফলাও করে ছেপেছিলেন।

আমরা জনাব ফজলুর রহমানের এই বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ নীচে উদ্ধৃত করছিঃ

'২৮শে এপ্রিল দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী শ্রী শরৎচন্দ্র বসুর সংগে যোগাযোগ করে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। বৈঠকে একপক্ষে শ্রী শরৎচন্দ্র বসু ও অপরপক্ষে জনাব সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দীন, আবুল হাশিম ও আমি ছিলাম। শ্রী বসু আলোচনার ভিত্তি হিসেবে কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবগুলো বিবেচনার পর পরিবর্তিতরূপে কয়েকটি সংশোধিত প্রস্তাবের উদ্ভব ঘটে এবং আরো আলোচনা চালিয়ে যাবার স্বপক্ষে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

'পরদিন শ্রী শরৎ বসু ও হিন্দু নেতাদের সংগে বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনার জন্যে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত সাব-কমিটির সদস্যদের মধ্যে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। এই বৈঠকে সাব-কমিটির সকল সদস্যই যোগদান করেন। উপযুক্ত প্রস্তাবাদি আলোচনার পর অধিকতর আলোচনার উদ্দেশ্যে পরবর্তী দিবস পর্যন্ত বৈঠক মুলতবী রাখা হয়।

'মুলতবী সভায় সাব-কমিটির সদস্যদের মধ্যে জনাব সোহরাওয়ার্দী ও আমি উপস্থিত ছিলাম। অপরপক্ষে ছিলেন শ্রীবসু ও শ্রী কিরণ শঙ্কর রায়। এই পর্যায়ে জনাব সোহরাওয়ার্দী ও আমি সিদ্ধান্ত করি যে, আলোচনায় আরো অগ্রসর হবার আগে আলোচনার প্রকৃতি সম্পর্কে কায়েদে আজমকে অবহিত করা ও প্রস্তাবগুলোর প্রতি তাঁর প্রতিক্রিয়া নিরূপন করা সমীচীন হবে।

'প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই আলোচনার গোড়াতেই আমরা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করি যে, আলোচনায় আমরা যদি---এবং যে-কোন প্রকারেই হোকনা কেন—সমঝোতায় উপনীত হই, তা' শুধু প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির নয়, অখিল ভারত মুসলিম লীগ হাই কমাণ্ডেরও অনুমোদন সাপেক্ষ হবে। বস্তুতঃ, তখনো পর্যন্ত আমাদের ও কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কোন প্রকার মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

'আলাপ-আলোচনায়' যে-সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হয় কিন্তু তখনো পর্যন্ত সেগুলোর ওপর মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সেগুলো হচ্ছে :

(১) বাংলা একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হবে। বাংলা সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ভারতের অবশিষ্ট অংশের সংগে বাংলার সম্পর্ক নির্ধারণ করবে।

(২) সংবিধান প্রণীত ও প্রযুক্ত হবার পর, প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকার-ভিত্তিতে ও যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি অনুসারে বাংলার আইনসভা নির্বাচিত হবে।

(৩) উভয়পক্ষ কর্তৃক ১ম ও ২য় অনুচ্ছেদ গৃহীত এবং বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষিত হবার পর বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে মুখ্যমন্ত্রী ব্যতীত অপর সকল পদের জন্যে সমানসংখ্যক মুসলিম ও হিন্দু (তফসিলী সম্প্রদায়সহ) সদস্য গ্রহণ করা হবে; মুখ্যমন্ত্রী পদে একজন মুসলমান নিযুক্ত হবেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হবেন একজন হিন্দু।

(৪) অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তফসিলী সম্প্রদায়সমূহ হিন্দুদের এবং মুসলমানদের চাকুরী ক্ষেত্রে সমান অংশ প্রদান করবেন।

(৫) বৃটিশ সরকার ১৯৪৮ সালের জুন মাসে কিংবা তৎপূর্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

(৬) শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্যে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস ১৬ জন মুসলিম, ও ১৪ জন হিন্দু সহ মোট ৩০ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান প্রণয়নকারী সংস্থা স্থাপন করবেন।

'মুসলিম জনমতের সকল অংশই সাধারণ নীতি হিসেবে যুক্তবাংলা চায়। লাহোর প্রস্তাব অনুসারে বাংলা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হওয়া উচিত বলে বিবেচনা করা হয়। এই রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক চরিত্রের হবে, না অন্য কোন রাষ্ট্রাদর্শগত রূপ পরিগ্রহ করবে, শুধু এই প্রশ্নেই মতদ্বৈধতার অবকাশ আছে।

'সাম্প্রদায়িক অনুপাত প্রথার ভিত্তিতে চাকুরি ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের সমান শরীকানাই বর্তমানের রীতি। তবে এই রীতি শুধু

অন্তর্বর্তীকালের জন্যেই প্রযোজ্য। মন্ত্রিসভায় হিন্দুদের অংশও শুধু অন্তর্বর্তীকালের জন্যেই প্রযোজ্য, কেননা নয়া শাসনতন্ত্রের অধীন ভবিষ্যত মন্ত্রিসভার গঠন প্রকৃতি নির্ভর করবে নয়া শাসনতন্ত্রের অধীন ভবিষ্যৎ আইনসভার গঠন প্রকৃতির উপর।

'আমরা মুসলমান জনসাধারণের মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন রয়েছি। যে কোন আলোচনার ক্ষেত্রেই এই মনোভাবের যথাযোগ্য গুরুত্ব স্বীকার ক'রে নিতে হবে। মনে রাখা দরকার যে এখনো পর্যন্ত আলোচনায় কোনরূপ মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কায়েদে আজমের প্রতিক্রিয়া আমরা জেনে নিয়েছি এবং ভবিষ্যতের আলাপ-আলোচনা এই প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতেই আমরা চালিয়ে যাব। যদি এই আলোচনায় কোনরূপ মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তা বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি ও কাউন্সিলের নিকট পেশ করা হবে এবং এই দুই সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত হলে অখিল ভারত মুসলিম লীগ হাই কমাণ্ডের নিকট পেশ করা হবে।

'মুসলিম লীগের নিযুক্ত সাব-কমিটি সম্পর্কে দুটি কথা বলতে চাই। জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী, জনাব নূরুল আমীন, জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী, জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী ও আমাকে নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়। গঠন সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবে কোথাও এ-কথা বলা হয়নি যে, সাব-কমিটির সদস্যরা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিই হিন্দু নেতাদের সংগে কোন প্রকার আলোচনা চালিয়ে যেতে পারবেন না। পক্ষান্তরে এই উদ্দেশ্যে আহূত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয় যে, কমিটির সদস্যরা একক বা সমষ্টিগতভাবে অপর পক্ষের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারবেন, তবে আলোচনার ফল সাব-কমিটির মাধ্যমেই ওয়ার্কিং কমিটির নিকট পেশ করতে হবে।

'আশা করি, এই বিবৃতি পাঠ ক'রে মুসলিম জনসাধারণ আলোচনার সঠিক প্রকৃতি অনুধাবনে সক্ষম হবেন।'

একটি পত্র

সম্পাদক মর্নিং নিউজ সমীপেষু

এতক্ষণে আমাদের পাঠকদের কাছে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, জনাব সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম বাংলার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার প্রতি চারদিক থেকেই হামলা আসছিলো.। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি, তখনকার দিনে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলী সম্পর্কে জনমতের প্রতিক্রিয়া নির্দ্ধারণের প্রয়াস ছিলো খুবই বিরল, কারণ এসব ব্যাপারে ভালোমন্দ সব কিছু সিদ্ধান্তই করা হতো সমাজের উপরের তলায়। তবু, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য আগত জনাব রুহুল কুদ্দুস বক্ষ্যমান সমস্যাটির উপর তাঁর মনের কথা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেন মর্নিং নিউজ সম্পাদককে লেখা একটি পত্রে। মর্নিং নিউজের ২০ মে সংখ্যায় এটি পত্রস্থ করা হয়। পত্রে জনাব রুহুল কুদ্দুস বলেন:

"জনাব, আপনার ১২-১৩ মে সংখ্যায় লিখিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ পাঠে স্তম্ভিত হলাম। আমি কোন রাজনৈতিক দলের অনুসারী নই, তবে আমি পাকিস্তানে বিশ্বাস করি। জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী ও জনাব আবুল হাশিমের অপরাধটা কী জানতে পারি কি? তাঁদের মতামত পাকিস্তানের প্রতিকূল বিবেচিত হয় কি যুক্তিতে? জনাব সোহরাওয়ার্দী এ-যাবৎ কোন নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি, কাজেই তাঁকে এ আলোচনা থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে। জনাব আবুল হাশিম অবিশ্যি প্রশাসন ব্যবস্থায় হারাহারি ভাগের (৫০:৫০ শরীকানার) কথা বলেছেন। কিন্তু সে-নিয়মই তো এমনকি বর্তমানেও চালু রয়েছে। নয় কি? ৫০টির মধ্যে কয়েকটি আসনের অধিকারী হবে মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল তফশিলী সম্প্রদায়গুলো। কাজেই হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাপ্য সকল সুযোগ-সুবিধা বর্ণহিন্দুরা এককভাবে কুক্ষিগত করতে পারবে না।

"তারপর আসে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির কথা। একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতির কি বিশেষ প্রয়োজন হতে পারে তা আমার বুদ্ধির অতীত। যে শ্রেণীর হাতে শাসন কর্তৃত্ব ন্যস্ত সে শ্রেণীর আবার রক্ষাকবচের কি প্রয়োজন হতে পারে? বরং হিন্দুরাই তাদের নিজের স্বার্থের খাতিরে বাংলায় যুক্ত নির্বাচনের বিরোধিতা করতে পারে। কাজেই, তাদের দিক থেকে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতির দাবী উত্থিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই কি বাঞ্ছনীয় হতো না?

"বাংলার সার্বভৌমত্বেও আপনার আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না। এটা মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবেরই উদ্দিষ্ট লক্ষ্য। জনাব আবুল হাশিমের ফর্মুলার উপর আপনি যে রায় দিয়ে ফেলেছেন সেটাও খুব সুচিন্তিত মনে হয় না। তিনি ফর্মুলাটি চূড়ান্ত বলে পেশ করেন নি; এতে যথেষ্ট রদবদলের অবকাশ ছিলো। আপনার নিবন্ধে এমন একটি মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে যা আমাদের অভিষ্ট ও কায়েদে আজমের নির্দেশিত মুসলিম ঐক্যের সংগে সংগতিপূর্ণ নয়।'

পত্রটির উপর সম্পাদক কোন মন্তব্য প্রকাশ করেননি।"

"সালারএ সুবার শেষ রক্তবিন্দু"

বেঙ্গল মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডস-এর সালারে সুবা জনাব আই, এ, মোহাজির সেদিনই এক বিবৃতিতে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ প্রতিরোধে 'মুসলমানদের দৃঢ় সঙ্কল্প' ঘোষণায় আর সবাইকে ছাড়িয়ে যান। তিনি বলেন: "বৃটিশ সরকার কিংবা পৃথিবীর অন্য কোন শক্তিরই কোন অধিকার নাই মুসলিম আবাসভূমির অঙ্গহানি করার।" "সর্বশেষ মুসলমানের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও আমরা এই ধরণের যে কোন চক্রান্তকে প্রতিরোধ করবো" বলেও তিনি ঘোষণা করেন।

তিনি আরো বলেন: "ইতিহাসের অধ্যায়ের পুনরাবর্তন ঘটবে। মাত্র ১৭ জন মুসলমান যদি সমগ্র বাংলাদেশ জয় করতে পারে, তাহলে

আজকের কয়েক কোটি বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রদায়েই বাংলাকে তাদের দখলে রাখতে পারবে।"

শ্রী মণ্ডলের আশঙ্কা প্রকাশ

অন্তর্বর্তীকালীন ভারত সরকারের অন্যতম সদস্য শ্রী যোগীন্দ্রনাথ মণ্ডল ২০শে মে এক বিবৃতিতে আশঙ্কা প্রকাশ করেন: "বাংলা বিভাগের অর্থ হবে পূর্ব বাংলার তফশিলী সম্প্রদায়সমূহের নিধন।"

হিন্দু-মুসলিম আলোচনা প্রসঙ্গে

শরৎ বসু

বৃটিশ সরকারের ৩রা জুনের ঘোষণার মাত্র পক্ষকাল পূর্বে ২০শে মে (১৯৪৭) শ্রী শরৎ বসু কংগ্রেস-লীগ যুক্ত কমিটির সদস্যদের সম্মানার্থ এক ভোজসভার আয়োজন করেন। এই ভোজসভায় বাংলার ভবিষ্যৎ শাসন কাঠামো সম্পর্কে একটি পরীক্ষামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৩ মে শরৎ বসু এক পত্রে মিঃ গান্ধীকে জানান:

"গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমার বাসভবনে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সোহরাওয়ার্দী, ফজলুর রহমান, আবুল হাশিম, ডাঃ আবদুল মালেক, কিরণ শঙ্কর রায় ও সত্য রঞ্জন বখশী উপস্থিত ছিলেন। আমরা একটা পরীক্ষামূলক চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম হই। আপনার বিবেচনার জন্যে চুক্তির নকল পাঠালাম। সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে অন্য সবার উপস্থিতিতে জনাব আবুল হাশিম ও আমি চুক্তিতে স্বাক্ষর করি। চুক্তিটি অবিশ্যি মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের নিকট পেশ করতে হবে। আমাদের আলোচনার ধারা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলার লীগ ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সম্ভবতঃ এখানে-ওখানে সামান্য রদবদল করে চুক্তিটি অনুমোদন করবে। আমার বিশ্বাস, আপনার সহযোগিতা ও উপদেশের সুবাদে যদি পরীক্ষামূলক

চুক্তিটির ভিত্তিতে একটি চূড়ান্ত চুক্তি সম্পাদন করা যায়, তাহলে যুগবৎ বাংলা ও আসামের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ভারতের অবশিষ্ট অংশের উপর তার প্রতিক্রিয়া অবিশ্যি কল্যাণকর হবে।'' *

এ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হচেছ যে, হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের মধ্যে যে আলোচনা চলছিলো তার মধ্যে এমন কিছুই ছিলো না যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে এক শ্রেণীর ''গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল'' ধরনের নেতারা তাঁদের প্রতিষ্ঠানকে ডিঙ্গিয়ে কিছু একটা করার কুমতলবে লিপ্ত ছিলেন।

মাউণ্টব্যাটেনের শর্ত

বাংলাকে অবিভক্ত রাখার দাবী নস্যাৎ করার দুরভিসন্ধি থেকেই ভাইসরয় লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এই শর্ত আরোপ করেন যে, একমাত্র কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে এ-সম্পর্কে পূর্ণ মতৈক্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতেই দাবীটি মেনে নেয়া যেতে পারে। কংগ্রেসের মন জানতেন মাউণ্টব্যাটেন, কংগ্রেস-তোষণেও তাঁর ক্লান্তি ছিলো না কোনদিন। তাই তাদের হয়ে এ-শর্ত আরোপে তাঁর কোন কুণ্ঠাবোধ ছিলো না। কিন্তু মুসলিম লীগ এই শর্ত প্রত্যাহারের কোন দাবী না তোলায় তাও পুরোপুরি কংগ্রেসের পক্ষেই যায়, কারণ কংগ্রেস কখনো বাংলাকে অবিভক্ত রাখার কোন পরিকল্পনায় সম্মত হবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না যেহেতু সে-ক্ষেত্রে গোটা বাংলাদেশই পাকিস্তানে চলে যায় লাহোর প্রস্তাব অনুসারে। তবে বাংলা লীগ এমনকি কংগ্রেসের ছত্রছায়ার বাইরেও বাংলার হিন্দু নেতাদের সংগে এই ব্যাপারে একটি সমঝোতায় উপনীত হতে পারলে মুসলিম লীগ হাই কমাণ্ডের পক্ষে এই প্রশ্নে দৃঢ়তর ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব হতো। কিন্তু সেটা হবার ছিলো না, কারণ আমাদেরই কয়েকজন পুণ্যশ্লোক বাঙ্গালী

* Pyare Lal : Mahatma Gandhi—The last phase.

লীগ নেতা শুধু জনাব সোহরাওয়ার্দী ও জনাব আবুল হাশিমকে বাংলার রাজনীতিতে কোনঠাসা করার ঐকান্তিক কামনায় বরাবর যুক্ত বাংলা ফর্মুলার বিরোধিতা করে আসছিলেন, এবং তা-ও করছিলেন লাহোর প্রস্তাবেরই পবিত্র নামাবলী গায়ে জড়িয়ে—যে-প্রস্তাবের বিঘোষিত লক্ষ্য ছিলো উত্তর ও পূর্ব ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোতে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের' প্রতিষ্ঠা। একটি মাত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে লাহোর প্রস্তাবের উপর যে-আপোষ-রফা করতে হয়েছিলো, যুক্ত বাংলা ফর্মুলা বা অনুরূপ কোন পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রস্তাবিত অঞ্চলগুলি বা তাদের বৃহত্তর অংশের সংহতি বিধান করা সম্ভব হলে তার কোন প্রয়োজন হতো না। এই রকম একটি মীমাংসা হলে তা-ই হতো কংগ্রেস-পৃষ্ঠপোষিত হিন্দু মহাসভাপন্থীদের নিশ্চিত পরাজয় তথা মুসলিম লীগের বৃহত্তর বিজয়ের সূচক। কিন্তু এই লক্ষ্য বর্জন করে মুসলিম লীগ কার্যতঃ যে-ভূমিকা গ্রহণ করে তা ইতিহাসের পাতায় আত্মসমর্পণের এক গ্লানিকর অধ্যায়রূপেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বস্তুতঃ মুসলিম লীগের সেই ভূমিকা ছিলো জেনে-শুনে বানিয়া কংগ্রেস, চরম ধর্মান্ধ হিন্দু মহাসভা ও উপ-মহাদেশে বৃটিশ রাজের শেষ প্রতিনিধি লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের গোপন আঁতাতের কাছে নতি স্বীকারেরই সামিল।

ভারতের বিভাগ প্রতিরোধ করার জন্য 'পাকিস্তানকে ব্যবচ্ছেদ' করার যে ষড়যন্ত্র ইতিপূর্বেই শুরু করা হয়েছিলো, বাংলার ঐক্যের আলোচনায় কিছুটা অগ্রগতি সাধনের পরই তা আরো প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে। হিন্দু সংবাদপত্রগুলির প্রচারনার অভিযান আরো বিষাক্ত হয়ে ওঠে এবং বাংলার ঐক্যপন্থী হিন্দু নেতারা তাঁদের ঐক্য প্রচেষ্টার প্রতি স্বীকৃতি দানে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অনীহার ফলে যাঁরা ইতিপূর্বেই অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন ক্রমাগত হতোদ্যম হয়ে পড়েন। ঐক্য প্রশ্নে আলোচনার জন্য

নয়াদিল্লী পৌঁছার পর তাঁর বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় তার ফলে শ্রী কিরণ শঙ্কর রায় এই আলোচনা থেকে সরে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত করেন। পরিণামে শরৎ বসুর একক কণ্ঠের আওয়াজ কংগ্রেস মহলে আর বড় একটা সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়নি।

তাঁদের পরিচয় অজ্ঞাত

ইতিমধ্যে কোন কোন পত্রিকায় এই মর্মে খবর প্রকাশিত হয় যে 'বাংলার আইন পরিষদের লীগ দলের বিদ্রোহী বলে কথিত গ্রুপ-ভুক্ত কয়েকজন প্রতিনিধি বাংলার মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনের দাবী পেশ করার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি দিল্লী গমন করেছেন।' জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার ২১শে মে এই খবরের সত্যতা অস্বীকার করে খবরটিকে 'সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন' বলে অভিহিত করেন। বাহার সাহেবের এই বিবৃতিটি মর্নিং নিউজের প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করে ছাপা হয় এই শিরোনাম দিয়ে:

> 'মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন নিয়ে জিন্নাহর সাথে কোন আলোচনা হয়নি: বাংলার ভবিষ্যৎ গঠনতন্ত্রই ছিলো প্রধান আলোচ্য বিষয়: হাবিবুল্লাহ বাহার কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদের সত্যতা অস্বীকার।'

কায়েদে আজম কর্তৃক যোগাযোগের রাস্তা দাবী: সামরিক জোট গঠনে আগ্রহ প্রকাশ

২১শে মে **কায়েদে আজম** হিন্দুস্তানের মধ্য দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সংযোগকারী একটি যোগাযোগের পথ দাবী করেন। তিনি হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে মৈত্রী ও পারস্পরিকতার সম্পর্ক স্থাপনের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি এমনকি দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সামরিক জোট গঠনের স্বপক্ষেও মত প্রকাশ করেন। রয়টারের প্রতিনিধি ডান ক্যাম্বেলকে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে প্রশ্নোত্তরকালে এই তিনটি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন এইভাবে—

প্রশ্ন : সশস্ত্র বাহিনীগুলো কিভাবে বণ্টন করা হবে বলে আপনি মনে করেন? পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের মধ্যে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি বা অনুরূপ কোন সামরিক জোট গঠিত হতে পারে বলে কি আপনার মনে হয়?

উত্তর : সবগুলো সশস্ত্র বাহিনীকেই পুরোপুরি বণ্টন করতে হবে। তবে উভয়ের পারস্পরিক স্বার্থে এবং যে-কোন বৈদেশিক আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি বা জোট গঠন করা উচিত হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

প্রশ্ন : বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের দাবী সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?

উত্তর : আমি পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের ঘোর বিরোধী। আমরা আপোষহীনভাবে এর প্রতিরোধ করবো।

প্রশ্ন : আপনি কি হিন্দুস্তানের মধ্য দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান রাষ্ট্রদ্বয়কে সংযোগকারী একটি পথ (করিডোর) দাবী করবেন?

উত্তর : হ্যাঁ।

আরেক প্রশ্নের জবাবে কায়েদে আজম বলেন: আমি এ-কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে চাই যে, একটিমাত্র অখণ্ড কনফেডারেশন গঠন কিংবা একাধিক গ্রুপে বিভক্ত কনফেডারেশন গঠন অথবা একক রাষ্ট্র হিসাবে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রসমূহের অবাধ অধিকার থাকবে।

কায়েদে আজম দাবীর তীব্র সমালোচনা

কায়েদে আজম করিডোর দাবীতে হিন্দু মহলে তীব্র সমালোচনার ঝড় ওঠে। হিন্দুস্তান টাইম্স্ ২৩শে মে সংখ্যার প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধে

লেখেন : "পাকিস্তানের অস্তিত্ব যদি 'করিডোরের' উপর নির্ভর করে তবে সে-পাকিস্তান কোনদিনই ধরা-ধামে অস্তিত্বমান হবে না।"

নেহেরু, কায়েদে আজমের 'করিডোর' দাবীর উপর সর্বপ্রথম মন্তব্য করেন ইউনাইটেড প্রেস অব আমেরিকাকে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে, তিনি বলেন, কায়েদে আজমের সাম্প্রতিক বিবৃতিটি একেবারেই অবাস্তব। এই বিবৃতিতে প্রমাণিত হয় যে, কোন প্রকার আপোষ-মীমাংসায় আসার কোন ইচ্ছাই তাঁর নেই। করিডোরের দাবীটি উদ্ভট ও অলীক। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে বিশেষ এলাকাসমূহের পৃথক হবার অধিকারসহ ভারত ইউনিয়ন গঠন। আর কোন নতুন দাবী উত্থাপন না করে এই ভিত্তিতে একটি আপোষ-রফা না হলে আমরা কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা স্বীকার করবো না। সে-ক্ষেত্রে আমরা সময়ক্ষেপ না করে ভারত ইউনিয়নের সংবিধান প্রণয়ন ও প্রযুক্তিকরণে আত্মনিয়োগ করবো।"

দৈনিক 'ডন' পত্রিকা 'বেহদ্দ পাজীর দল' (ক্র্যাঙ্ক্‌স্ অল) শীর্ষক এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য করেন : "করিডোরের দাবীটি অভিনব কিছু নয়। পাকিস্তানের বিশেষ অবস্থানের জন্য অপরিহার্য এই করিডোরের কথা ইতিপূর্বে বহুবার বলেছেন কায়েদে আজম জিন্নাহ। পাকিস্তানকে বাস্তব, সুদৃঢ় ও শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের সংযোগ সাধনকারী একটি করিডোর অপরিহার্য। সে যাই হোক, আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলমানেরা যদি পাকিস্তান অর্জন করতে পারে—বস্তুতঃ তারা ইতিমধ্যেই তা করতে সক্ষম হয়েছে বলতে পারি—তাহলে তারা পাকিস্তানের দুই অংশের যোগ সাধনের জন্য কোথাও না কোথাও একটি করিডোরও নির্মাণ করে নিতে পারবে।"

একটি খবর ও তার প্রতিবাদ

২৪শে মে সংবাদপত্রের এক খবরে বলা হয় : ২২শে মে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় বাংলার ভবিষ্যৎ

শাসনতন্ত্রের প্রশ্নটি আলোচিত হয়। বোস-সোহরাওয়ার্দী ফর্মুলাটি কমিটির বিবেচনার্থ উত্থাপন করা হয়। কিন্তু এ-সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই ২৮শে মে পর্যন্ত বৈঠক মুলতবী রাখা হয়।

জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার এই খবরের সত্যতা অস্বীকার করে বলেন: "বোস-সোহরাওয়ার্দী" ফর্মুলাটি কখনো ওয়ার্কিং কমিটির সভায় উত্থাপন করা হয় নাই। আশা করা যাচ্ছে যে, বাংলার ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলাপ আলোচনার জন্য প্রাদেশিক লীগ কর্তৃক নিযুক্ত সাব কমিটির কাছে আগামী ২৭শে মে এই ফর্মুলাটি পেশ করা হবে। ২৮শে মে ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সাব-কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করা হবে।"

আলী আহমদ খানের দৃষ্টিতে

২৬শে মে জনাব আলী আহমদ খান এম, এল, এ তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে তৎকালীন পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করে এক বিবৃতিতে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন:

"বাংলার বর্তমান সাম্প্রদায়িক সমস্যাজনিত জটিলতার জট ছাড়াবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, অবিভক্ত সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র, বা সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি। এই তিক্ততার অবসানের জন্য বাংলার দুই মহান সম্প্রদায়ের উচিত এই আদর্শকে বরণ করে নেয়া—যাকে হিন্দুরা অবিভক্ত, সার্বভৌম বাংলা এবং মুসলমানেরা 'মুসলমানদের জাতীয় আবাসভূমি' সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান বলে অভিহিত করতে পারেন।"

তিনি অনুকরণযোগ্য যুক্তি-নিষ্ঠার সংগে বলেন: "যেহেতু লোক-বিনিময় সম্ভব নয়, সেহেতু সকল বাংগালীর উচিত বাংলাদেশে শান্তি ও সম্প্রীতির সংগে সহ-অবস্থান করা—যেমন তারা করে আসছে স্মরণের অতীত আবহমান কাল থেকে। বাংলাকে বিভক্ত করা হলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান তিক্ততা সৃষ্টি অবধারিত। তাছাড়া

বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলায়, হিন্দুদের ও পশ্চিম বাংলায় মুসলমানদের নিরাপত্তা বলতে আর কিছু থাকবে না।"

জনাব খান আরো বলেন: "পূর্ব পাকিস্তান' বলতে কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থহানিকর কিছু বোঝায় না ; 'পূর্ব পাকিস্তান' মানে বাংলার মুক্তি, শৃঙখলবন্ধন নয়। পক্ষান্তরে, বাংলাকে যদি বিভাগ করা হয় তাহলে তা হবে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থের পক্ষে চরম হানিকর, কেননা সে অবস্থায় তারা বৃটিশ ও অবাঙ্গালী পুঁজি ও কায়েমী স্বার্থের দাসত্ব-নিগড়ে বন্দী হয়ে যাবে চিরতরে।"

উপসংহারে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন: "বিভক্ত বাংলা সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও চরম দারিদ্র্যের নিষ্করুণ যাতনায় ধুঁকে ধুঁকে মরবে। কাজেই, দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য মরণপণ সংকল্পের সংগে বিভাগের চক্রান্ত প্রতিরোধ করাই হবে হিন্দু-মুসলিম-তফশিলী-নির্বিশেষে বাংলার সকল দেশপ্রেমী সন্তানের পবিত্রতম কর্তব্য।"

গভর্ণর বারোর উদ্বেগ

২৭ শে মে কলকাতার অস্থিত অবস্থা এবং ক্রমবর্ধমান ও অপ্রত্যাশিত উত্তেজনা বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বাংলার রাজ্যপাল বারো দিল্লীকে জানান। তিনি অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরের বরাত দিয়ে বলেন, নেহেরু নাকি বলেছেন যে, ২রা জুন থেকে সংগ্রামের একটি নতুন পর্যায় শুরু হবে এবং শান্তিপূর্ণ মীমাংসার ব্যাপারে তিনি খুব আশাবাদী নন। কিন্তু যথাবিহিত অনুসন্ধানের পর গভর্ণর মহোদয়ের এই উক্তির প্রামাণিকতা প্রতিপন্ন করা সম্ভব হয় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর এই উক্তিটি মিথ্যা বলেই প্রমাণিত হয়।

প্রাদেশিক লীগ কর্তৃক বাংলার ভবিষ্যৎ কায়েদে আজমের হস্তে সমর্পণ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ২৭শে মে, ১৯৪৭ বাংলার ভবিষ্যৎ কায়েদে আজমের হস্তে সমর্পণ করে ঘোষণা করেন: "ভারতের সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রশ্নে আলাপ আলোচনা করার ও মীমাংসায় উপনীত হবার এখতিয়ার শুধু তাঁরই আছে। বাংলার মুসলমানেরা তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেবে।"

৩০শে মে মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকাগুলোতে সংবাদটি পরিবেশিত হয় এভাবে:

"২৮শে মে বুধবার সন্ধ্যা ৮টা থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির ৫ ঘণ্টাব্যাপী এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে বাংলার সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের ভবিষ্যৎ মনোভাব সম্পর্কে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবটি নিম্নরূপ:

"ওয়ার্কিং কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করছে যে, বাংলার শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধানের জন্য কোন কোন সংবাদপত্রে যে প্রস্তাবাদি প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলির সংগে ওয়ার্কিং কমিটি বা তন্নিযুক্ত সাব-কমিটির কোন সম্পর্ক নাই।

"ওয়ার্কিং কমিটি মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর প্রতি অবিচলিত রয়েছে। কমিটি পুনরায় কায়েদে আজম এম, এ, জিন্নাহর নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা ঘোষণা করছে। কমিটি আরও ঘোষণা করছে যে, ভারতের সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রশ্নে আলাপ আলোচনা করার ও মীমাংসায় উপনীত হবার এখতিয়ার শুধু তাঁরই আছে। বাংলার মুসলমানেরা তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেবে।

খবরে আরো বলা হয়, "জনাব মওলানা আকরম খাঁ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। ওয়ার্কিং কমিটির ২৭ জন সদস্যের মধ্যে ২৪ জন উপস্থিত

ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জনাব খাজা নাজিমুদ্দিন, জনাব নূরুল আমীন, জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার, জনাব তমিজুদ্দীন খান, এবং মাননীয় মন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমান ও জনাব শামসুদ্দীন আহমদ। মুখ্যমন্ত্রী জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী, শিক্ষামন্ত্রী জনাব মোয়াজ্জেমুদ্দীন হোসেন ও জনাব এম, এ, এইচ, ইস্পাহানী এই সভায় অনুপস্থিত ছিলেন।

"বৈঠকে আলোচনা চলাকালে প্রায় ১০০ ছাত্রের একটি দল লীগ অফিসের সম্মুখে সমবেত হয়। তাঁরা বসু ফর্মুলা প্রত্যাখ্যান করে বিষয়টি অখিল ভারত মুসলিম লীগ হাই কমাণ্ডের হাতে ছেড়ে দেবার স্বপক্ষে মতামত জ্ঞাপন করেন"।

"জানা গেছে যে মওলানা আকরম খাঁ আজ বিমানযোগে দিল্লী যাত্রা করবেন। তাঁর সহগামী হবেন জনাব নূরুল আমীন, জনাব হাবিবুল্লাহ্ বাহার চৌধুরী ও জনাব হামিদুল হক চৌধুরী। তাঁরা কায়েদে আজম ও লীগ হাই কমাণ্ডকে বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করবেন"।

"হিন্দু নেতাদের সংগে বাংলার রাজনৈতিক সমস্যাবলী আলোচনার জন্য নিযুক্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের সাব-কমিটি ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। ওয়ার্কিং কমিটির জনৈক সদস্য গতকাল (২৯ মে এক সাক্ষাৎকারে) আমাকে (ষ্টাফ রিপোর্টার) বলেন, যেহেতু কংগ্রেস এই উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কমিটি নিয়োগ করে নাই সেহেতু মুসলিম লীগের এই সাব-কমিটি জিইয়ে রেখে আর কি লাভ?"

আদর্শে অটল শরৎ বসু

৩১শে মে শরৎ বসু দিল্লীতে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে যুক্ত বাংলা দাবীর পুনর্ঘোষণা করেন। মিঃ গান্ধীর সংগে সাক্ষাতের পর তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে, গান্ধীর সাথে তিনি বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে,

বিশেষ ক'রে বঙ্গ-ভঙ্গের বিকল্প হিসেবে স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

শ্রী বসু এই মত প্রকাশ করেন যে, কংগ্রেস হাইকমাণ্ড যদি তাঁর পরিকল্পনা অনুমোদন করে তাহলে লীগ হাই কমাণ্ডকে জনাব সোহরাওয়ার্দীর যুক্ত বাংলা পরিকল্পনা অনুমোদনে রাজী করানো সহজসাধ্য হবে। তাঁর ও জনাব সোহরাওয়ার্দীর পরিকল্পনার মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন।

যুক্ত-বাংলা দাবী পুনরুত্থাপন করে শ্রী বসু বলেন: "আমার প্রস্তাবে আমার গভীর বিশ্বাস আছে। এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য আমি শেষ পর্যন্ত লড়ে যাব। কংগ্রেসের অন্য নেতাদের সংগে সাক্ষাৎ করে বঙ্গ-ভঙ্গ রোধের সকল সম্ভাবনাই বিবেচনা করে দেখবো।"

অখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক

১লা জুন অখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য নয়াদিল্লীতে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকের কার্যবিবরণী সাধারণ্যে প্রকাশ করা হয় নাই। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন: জনাব নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান, জনাব সরদার আবদুর রব নিশতার, জনাব কেরামত আলী, জনাব লতিফুর রহমান, জনাব নওয়াব ইসমাইল খান, জনাব এম, এ, ইস্পাহানী, জনাব সৈয়দ আবদুর রউফ, জনাব মওলানা আকরম খাঁ, জনাব কাজী মুহম্মদ ঈসা, জনাব মিয়া বশীর আহমদ, জনাব চৌধুরী খালিকুজ্জামান, জনাব মামদোতের খান, জনাব রাজা গজনফর আলী খান ও জনাব গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লাহ।

জনাব এম, এ, মতিন চৌধুরী, জনাব খাজা নাজিমুদ্দীন ও জনাব এম, এ, খুরোও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বলে সংশ্লিষ্ট খবরে উল্লেখ করা হয়।

'সার্বভৌম বাংলার' বিয়োগে মর্ণিং নিউজের 'শোক'

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে ১লা জুন সংখ্যা মর্ণিং নিউজের 'সার্বভৌম বাংলার জীবন-চরিত ও মৃত্যুকাহিনী' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়:

"পাকিস্তান জাতীয় রাষ্ট্রের সংগে সম্পর্কহীন সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র নামে যে কল্পশিশুটি বহু পূর্বেই ভ্রূনস্থ হয়েছিলো যদিও প্রকৃত-প্রস্তাবে সে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো নয়া দিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রী জনাব এইচ, এস সোহরাওয়ার্দীর সাংবাদিক সম্মেলনে সে শিশুটি তার স্বাভাবিক মৃত্যু-বরণ করে গত ২৮শে মে—যখন বাংলা লীগ ওয়ার্কিং কমিটি দ্ব্যর্থহীনভাবে 'বসু ফর্মূলা' নিন্দার সংগে প্রত্যাখ্যান করে 'মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীতে অটল থাকার' সংকল্প ঘোষণা করেন। এর আকস্মিক জন্মলাভেও যেমন কেউ উল্লসিত হয়নি, তেমনি এর অবশ্যম্ভাবী অকালমৃত্যুতেও কেউ হয়নি শোকে মুহ্যমান, কেউ গায়নি শোক গাঁথা, সম্ভ্রমে নমিত হয়নি কারু মস্তক। আমরা এই শোক গাঁথা প্রকাশ করছি শুধু সার্বভৌম বাংলা নামক কল্পশিশুটির জন্ম, তার জীবনমরণ সংগ্রাম ও তার শোচনীয়রূপে স্বল্পায়ু কিন্তু অক্লান্তকর্মা জীবনের কাহিনী বয়ান করার উদ্দেশ্যে। তবে, বড় সমস্যার মোকাবেলা করতে গিয়ে ছোট বুদ্ধির মানুষরা কি পরিমাণ আহাম্মুকির পরিচয় দিতে পারে তার প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করাও এর উদ্দেশ্য।

"এ-কথা স্বীকার না করলে জনাব সোহরাওয়ার্দীর প্রতি অবিচার করা হবে যে, দিল্লীর সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণদানকালে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের সংগে সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্রের কি সম্পর্ক হবে সে বিষয়ে সতর্কতার সংগে নীরবতা অবলম্বন করেন। কিন্তু তাঁর চ্যালা-চামুণ্ডারা, খাস করে বাংলা লীগের ছুটিভোগী সেক্রেটারী জনাব আবুল হাশিম, তাঁদের গুরুকে সমর্থন করার ভ্রান্ত আগ্রহাতিশয্যে হয়তো অজান্তিকে পাকিস্তানকেই নস্যাৎ করার কাজে মাতেন।"

মর্ণিং নিউজ আরো বলেন, "এভাবেই অপমৃত্যু ঘটেছে সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্রের ঘৃণ্য প্রস্তাবনাটির।

বাংলা হবে পাকিস্তান জাতীয় রাষ্ট্রেরই একটি সার্বভৌম অঙ্গ—স্বায়ত্তশাসিত পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত অপর অঙ্গগুলির সমমর্যাদা সম্পন্ন।

তাদের চাইতে কোন অংশেই খাটো নয়, কিন্তু তাদের সঙ্গে একটি সাধারণ ভাষা, সাধারণ ধর্ম, সাধারণ সংস্কৃতি, সাধারণ ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার, সাধারণ সুখ-দুঃখ ও সাধারণ আশা-আকাংখার পবিত্র বন্ধনে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ। পশ্চিমে পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত, বেলুচিস্তান এবং পূর্বে বাংলা ও আসাম সমন্বয়ে গঠিত মহান পাকিস্তান কমনওয়েলথ বিশ্বের একটি অনুপম আদর্শ স্থানীয় রাষ্ট্র, সুখী, সমৃদ্ধিশালী এবং শান্তি ও প্রগতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন।"

বিভাগ প্রতিরোধ সম্মেলনে জনাব হাবিবুল্লাহ বাহারের ভাষণ

সেদিনই প্রাদেশিক লীগের অস্থায়ী সেক্রেটারী জনাব হাবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী যশোরে বিভাগ-প্রতিরোধ সম্মেলনে ভাষণদান করেন। মর্ণিং নিউজে তাঁর ভাষণের শিরোনাম দেয়া হয়: "মুসলমানেরা মানবতার ভিত্তির উপর গড়ে তুলবে নতুন তাজমহল।" জনাব বাহারের ভাষণের সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ নিম্নরূপ:

"এক শ্রেণীর হিন্দুরা তাদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাকে বিভক্ত করার আন্দোলন শুরু করেছেন।----কিন্তু পূর্ব-বাংলার ১ কোটি ২৯ লক্ষ হিন্দু অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এর বিরোধিতা করেন। এমন কি. শ্রী শরৎ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি বিরাট অংশও যুক্ত বাংলার স্বপক্ষে। **যুক্ত বাংলা হবে বিশ্বের একটি অন্যতম সেরা শক্তিশালী রাষ্ট্র।"**

বৃটিশ সরকারের ৩রা জুন পরিকল্পনা ঘোষণা

৩রা জুন ভাইসরয় লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বৃটিশ সরকারের ভারত বিভাগ পরিকল্পনা ঘোষণা করেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ৩রা জুন অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে ভাষণ-দানকালে বৃটিশ পরিকল্পনায় সম্মতিজ্ঞাপন করে উপসংহার টানেন এই বলে: "আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধির মানুষ বৃহৎ কাজের দায়িত্ব বহন করছি। তবু, যেহেতু কাজটি বৃহৎ বা মহৎ, তার সেই বিপুল মহত্ত্বের ছিঁটেফোটা ছিটকে এসে পড়ে আমাদের ওপরও।"

মুসলিম লীগের পক্ষে প্রদত্ত ভাষণে কায়েদে আজম তাঁকে ইতিপূর্বে বেতার ভাষণের সুযোগ দেয়া হয়নি বলে একটি প্রচ্ছন্ন সমালোচনার গৌরচন্দ্রিকা জুড়ে দেন।

তিনি বলেন: "আশা করা যায় ভবিষ্যতে আমাকে আমার কণ্ঠের আওয়াজ ও মত প্রকাশের অধিকতর সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে। যাতে করে আমার বাণী আপনাদের কাছে খবরের কাগজের নিষ্প্রাণ মুদ্রিত অক্ষরের পরিবর্তে ঈথার তরঙ্গে সজীব ও টাটকা অবস্থায় পৌঁছে দিতে পারি।

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভাইসরয়কে বহু প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে। আমার মনে তিনি এই ধারনারই সৃষ্টি করেছেন যে, ন্যায়বিচার ও পক্ষপাতশূণ্যতার উন্নততম আদর্শেই তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। শান্তিপূর্ণভাবে ও সুশৃঙখল পদ্ধতিতে তাঁর উপরে ন্যস্ত ভারতের জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব পালনের পথে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করাই আমাদের কর্তব্য।

"বৃটিশ সরকার আমাদের কাছে যে পরিকল্পনা পেশ করেছেন সেটাকে আমরা একটা আপোষ হিসেবেই মেনে নেব, না চূড়ান্ত

সমাধান হিসেবে মেনে নেব সেটা বিবেচনা করার ভার আমাদের উপর বর্তেছে। এই প্রশ্নে আমি কোন আগাম সিদ্ধান্ত দিয়ে রাখতে ইচ্ছুক নই।"

লীগ কাউন্সিল বৈঠক অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত

৫ই জুন জনাব মওলানা আকরম খাঁ নয়া দিল্লী থেকে প্রদত্ত এক বিজ্ঞপ্তি মারফৎ বঙ্গীয় মুসলিম লীগ কাউন্সিলের বৈঠক অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। ১৪ ও ১৫ই জুন (১৯৪৭) ফরিদপুরে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল।

বিজ্ঞপ্তিতে জনাব মওলানা সাহেব বলেন : "বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটির ২৮শে মে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত প্রস্তাবক্রমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমি এতদ্বারা প্রাদেশিক লীগসহ সকল শাখা লীগের পুনর্গঠনকার্য অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি। আগামী ১৪ ও ১৫ই জুন ফরিদপুরে অনুষ্ঠিতব্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের বৈঠকও আমি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করছি।"

জনাব মওলানা সাহেব আরো বলেন: "পাকিস্তান সংক্রান্ত যুগান্তকারী ঘোষণার ফলে উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই আমি উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়েছি।"

মুসলিম বাংলার প্রতিক্রিয়া

বৃটিশ সরকারের ৩রা জুন পরিকল্পনায় মুসলিম বাংলায় যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তার সার সংকলন করা যায় মর্ণিং নিউজের এই রিপোর্ট থেকে:

"মুসলমানদের মন ভোলানোর জন্যে সিলেটকে পূর্ব পাকিস্তানে যোগ দেয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে। সিলেট একটি ঘাটতি এলাকা;

কাজেই সিলেটের অন্তর্ভুক্তি পাকিস্তানের জন্যে সম্পদের পরিবর্তে দায় স্বরূপই হয়ে দাঁড়াবে। আসামের অন্যান্য এলাকার মুসলমানদের আশা-আকাঙখার গুড়ে বালি দেয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা দুইটি পশ্চিম বঙ্গের সংলগ্ন না হওয়া সত্বেও সেই প্রদেশের সংগেই তাদের জুড়ে দেয়া হয়েছে। আবার অন্যদিকে বিহারের পুর্ণিয়া জেলা উত্তর বঙ্গের সংগে সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও গায়ের জোরে তাকে হিন্দুস্তান এলাকার মধ্যে রাখা হয়েছে। কলকাতার ভবিষ্যৎ যে কী হবে সে সম্পর্কে কিছু বলাই হয়নি।"

ভারত বিভাগ পরিকল্পনায় বার্মার ক্ষোভ

বার্মার এ, এফ, পি, এফ-এল-এর প্রেসিডেণ্ট ও অন্তবর্তীকালীন বার্মা সরকারের ডেপুটি চেয়ারম্যান উ আউং সান ভারত বিভাগ পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন। ৫ই জুন রেঙ্গুনে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন: "ভারতের দ্বিধা বিভক্তি শুধু ভারতীয়দের জন্য নয়, সমগ্র এশিয়া ও বিশ্ব-শান্তির পক্ষে অশুভ সম্ভাবনার ইঙ্গিতবাহী। ভারতের নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে বার্মা এই অলক্ষুণে সমাধানে উদ্বেগবোধ না ক'রে পারে না; একে আদৌ 'সমাধান' বলে অভিহিত করা যায় কিনা সেটা অবিশ্যি প্রশ্নসাপেক্ষ।"

জনাব ফিরোজ খান নুন

পাঞ্জাবের মুসলিম লীগ নেতা জনাব ফিরোজ খান নুন এই পরিকল্পনার সমালোচনায় গভীর পরিতাপের সংগে মন্তব্য করেন: "৪০ লক্ষ মুসলমানকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে শিখদের মনস্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।"

পরিকল্পনা গ্রহণে অখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সম্মতি

সেদিনই (৫ই জুন, ১৯৪৭) অখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিল বৃটিশ সরকারের ৩রা জুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে নেন, স্বভাবতঃই বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের স্বপক্ষেই সিদ্ধান্ত করা হয়। সংবাদপত্রের খবর থেকে জানা যায়, কাউন্সিলের ৮ জন সদস্য পরিকল্পনা গ্রহণের বিরুদ্ধে ভোটপ্রদান করেন; কিন্তু ৪০০ জন সদস্য ভোট দেন স্বপক্ষে। কাউন্সিলের মোট সদস্য সংখ্যা ছিলো ৪৭৫। আড়াই ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা ও বিতর্কের পর পরিকল্পনাটি গ্রহণের স্বপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার স্তম্ভে কাউন্সিল বৈঠকে বিরুদ্ধ মত দাবিয়ে রাখার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। এই অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে জনাব হামিদুল হক চৌধুরী বলেন যে, পরিকল্পনাটি প্রত্যাখ্যানের সুপারিশ করে প্রথম বক্তৃতা করেন কাউন্সিলের বাংগালী সদস্য অধ্যাপক জনাব রহীম। এই সুপারিশের সমর্থনে দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন জনাব জেড, এইচ, লারী। উভয়ের বক্তৃতা একই ধরনের ছিল বলে জনাব চৌধুরী মন্তব্য করেন।

পরিস্থিতির আকস্মিক মোড় পরিবর্তন

অখিল ভারত মুসলিম লীগ কর্তৃক বৃটিশ সরকারের পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে পরিস্থিতির আকস্মিক মোড় পরিবর্তন ঘটে। বাংলা-আসাম সীমান্ত নির্ধারণ কমিশনের কাছে পেশ করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের দাবী দাওয়া নির্ণয়ের জন্য একটি কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে ১০ই জুন মর্ণিং নিউজ অফিসে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ ইতরাত হোসেন জুবেরীকে সভাপতি এবং অধ্যাপক নফিস আহমদ, ডঃ আতাউল হাকিম, জনাব সৈয়দ মোহসিন আলী (মর্ণিং নিউজের তৎকালীন অস্থায়ী সম্পাদক),

জনাব জহিরুল হক ও অধ্যাপক সুলতানুল ইসলামকে সদস্য নিযুক্ত করে এই কমিটি গঠন করা হয়।

বাংলা ও আসামে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোর ভৌগোলিক অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুত্বগত অবস্থান সম্পর্কে তথ্য ও পরিসংখ্যান সঙ্কলন করে তার ভিত্তিতে প্রণীত স্মারকলিপি মুসলিম লীগের মাধ্যমে সীমানা নির্ধারণ কমিশনের কাছে পেশ করাই এই কমিটির লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হয়।

অকাল প্রচারণা

পরের দিন ১১ই জুন, কলকাতার মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয় যে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হবে চট্টগ্রাম। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সরকারী মহলের বরাত দিয়ে লীগ পত্রিকাগুলির মাধ্যমে এমন ব্যাপক আগাম প্রচারনায় অনেকেই বিস্ময়াবিষ্ট ও বিমূঢ় হয়ে যান। প্রকাশিত সংবাদে আরো বলা হয় যে 'স্থান নির্বাচনের প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই অনেকদূর এগিয়ে গেছে এবং পূর্ব পাকিস্তান সরকারের দফতর চট্টগ্রামের ২০ মাইল ব্যাস্যার্ধের মধ্যে স্থাপন করা হবে।'

অনেকের মতে, বাংলাবিভাগ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই এই রকম একটি অনাহুত কল্পনার বুদ্বুদ নিয়ে এতোটা হৈ চৈ করার ফলে কলকাতার উপর মুসলিম লীগের দাবী একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়ে।

বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য এম, এল, এ দের বৈঠক আহ্বান

বাংলার গবর্ণর ১১ই জুনের এক ঘোষণায় বাংলা বিভাগ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ২০শে জুন বাংলার এম, এল, এ দের এক বৈঠক আহ্বান করেন এবং নির্দিষ্ট দিনে পরিষদ কক্ষে উপস্থিতির নির্দেশ দিয়ে এম,

এল, এ দের কাছে আমন্ত্রণ লিপি প্রেরণ করেন। এই উদ্দেশ্যে প্রচারিত গবর্ণরের বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হয় যে, বঙ্গীয় আইনপরিষদের যে অংশ বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে সে অংশের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন মাননীয় জনাব নূরুল আমীন; অবশিষ্ট অংশের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্যার উদয় চাঁদ মাহতাব, কে, সি, আই, ই। বিজ্ঞপ্তিতে আরো নির্দেশ দেয়া হয় যে, বৃটিশ সরকারের ৩রা জুন বিবৃতিতে উল্লিখিত সদস্যদের যুক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন জনাব নূরুল আমীন। অনুরূপ অধিবেশন যদি অনুষ্ঠিত হয় তা হলে আইন সভার পরিষদ কক্ষই হবে তার অনুষ্ঠানস্থল।

আবার আগাম প্রচারনা—এবারের লক্ষ্য দু'টি ?

জনাব সোহরাওয়ার্দী ও জনাব আবুল হাশিমের বিরোধী কয়েকজন মুসলিম লীগ নেতা ১২ই জুন দিল্লী থেকে কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। মর্ণিং নিউজ তাঁদের বরাত দিয়ে পাঠকদের জানান যে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় স্থাপন করার ব্যাপারে মোটামুটি একটা মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার আরেক কদম এগিয়ে বলেন: "বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়েছে যে জনাব খাজা নাজিমুদ্দীনকে বাংলার রাজনীতিতে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। নয়া সরকারের সম্ভাব্য কর্ণধার হিসেবে তাঁরই নাম শুনতে পাওয়া যায়।"

৩রা জুন পরিকল্পনায় কংগ্রেসের সম্মতি

অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ১৫ই জুন অধিবেশনে ১৫৭-২৯ ভোটে বৃটিশ সরকারের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ৩২ জন সদস্য ভোট দানে বিরত থাকেন। উপস্থিত সদস্যের সংখ্যা ছিলো ২১৮। কমিটির নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে দীর্ঘ ৮ ঘণ্টাব্যাপী তুমুল বিতর্কের

পর প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিতর্কজনিত উত্তেজনাকর পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য নেহরু ও প্যাটেলকে খোলাখুলি বলতে হয়েছিলো যে, কমিটির সামনে 'দু'টিমাত্র বিকল্প পথ রয়েছে : দেশবিভাগের নীতিতে সম্মতিজ্ঞাপন করা, অথবা ভারতের শতধা বিচ্ছিন্নকরণ (বলকানাইজেশন) ও নিরন্তর নৈরাজ্যের নিশ্চিত সম্ভাবনা মেনে নেয়া।

লীগ পার্লামেণ্টারী বোর্ডের বৈঠক

অখিল ভারত মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী বোর্ড গণপরিষদে নির্বাচনের জন্য পূর্ব বাংলার প্রার্থীদের নাম বিবেচনার উদ্দেশ্যে ১৮ই জুন দিল্লীতে এক বৈঠকে মিলিত হন।

স্যার ওলাফ কর্তৃক একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন

১৮ই-জুন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গবর্নর স্যার ওলাফ ক্যারো তাঁর বিরুদ্ধে আনীত একদেশদর্শিতার অভিযোগের উল্লেখ করেন। সীমান্ত প্রদেশের আসন্ন গণভোটের প্রেক্ষিতে এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থের খাতিরে তিনি ক্ষমতার হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত দুই মাসের জন্য ছুটিতে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়াতে স্যার ওলাফ ক্যারো যুক্তরাজ্য যাত্রা করেন এবং স্যার রব ম্যাকগ্রেগর ম্যাকডোনাল্ড লকহার্ট সীমান্তের অস্থায়ী গবর্ণর হিসেবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

পাকিস্তান রাষ্ট্র বাংলার স্বপক্ষে ভোটদানের জন্য সিলেট বাসীর নিকট আবেদন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী ২০শে জুন সিলেটের জনগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক আবেদনে বলেন : "সিলেটের ভোটদাতাদের প্রত্যেকের অবশ্য-কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের জাতীয় ইতিহাসের এই ক্রান্তিলগ্নে পাকিস্তান রাষ্ট্র বাংলায় যোগদানের স্বপক্ষে ভোটদান করা।"

বাংলা দ্বিধাবিভক্ত

২০শে জুন বাংলা বিভাগ প্রশ্নের উপর ভোট গ্রহণ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ভোটের ফলাফল একটু সাবধানতার সঙ্গে খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের ভাগ্য-নির্ধারণের নামে কি প্রবঞ্চনা আর প্রহসনের অভিনয় করা হয়েছে বাংলার জনগণের ভাগ্য নিয়ে। বাংলাকে বিভাগ করার নীতিগত প্রশ্ন উত্থাপন এবং তাকে জনমত যাচাইয়ের ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করাটাই স্বতঃ গণতন্ত্রের নামে শঠতা বৈ কিছু নয়। কিন্তু তবু এই শঠতার প্রতিরোধ না করে বাংলার ভাগ্যনির্ধারনের গণতন্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়!

শুক্রবার ২০শে জুন পরিষদভবনে নির্ধারিত নিয়ম অনুসারেই বঙ্গীয় আইন সভার দুই অংশের বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে আহূত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় জনাব নূরুল আমীন (স্পীকার)-এর সভাপতিত্বে পরিষদে বাংলার মুসলিম সংখ্যাগুরু জেলাগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী অংশ ১০৬-৩৫ ভোটে প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে বাংলা বিভাগ করা চলবে না।

বর্ধমানের মহারাজার সভাপতিত্বে বাংলার অমুসলিম সংখ্যাগুরু অংশ ৫৮-২১ ভোটে প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে বাংলা বিভাগ করতে হবে।

উভয় অংশের যুক্ত বৈঠক ১২৬-৯০ ভোটে 'বর্তমান গণপরিষদে' যোগদানের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তিনজন কমিউনিস্ট সদস্য ভোটদানে বিরত থাকেন। পৃথক বৈঠকে গরহাজির একজন মুসলিম সদস্য এই যুক্ত বৈঠকে উপস্থিত থাকেন; একজন কংগ্রেস সদস্য ভোটদানে অংশগ্রহণ করেন নাই। মুসলিম সংখ্যাগুরু জেলাগুলির প্রতিনিধিত্বকারী অংশ ১০৫-৩৬ ভোটে 'সিলেট জেলার পর্ব পাকিস্তানভুক্তি' কামনা করে প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

মোট ১০২ জন মুসলিম সদস্যের মধ্যে ৯৯ জন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। গরহাজির সদস্যদের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য জনাব এ, কে, ফজলুল হক। তিনি শহরের বাইরে এবং অসুস্থ ছিলেন। অপর দুইজন অনুপস্থিত সদস্য ছিলেন জনাব শামসুল হুদা ও জনাব খুররম খান পন্নী।

যুক্ত অধিবেশনটি শুরু হয় ঠিক অপরাহ্ণ তিনটায়, জনাব নূরুল আমীনের সভাপতিত্বে। বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ভীড়ে নীচের প্রায় সবগুলো গ্যালারীতে ঠাসাঠাসি অবস্থা হয়ে যায়। একজন সাংবাদিক সেই কায়রো থেকে কলকাতায় উড়ে আসেন 'একটি নতুন জাতির জন্ম লগ্নে' প্রত্যক্ষ-দর্শী হবার আশায়।

যুক্ত অধিবেশন ১২৬-৯৩ ভোটে 'বর্তমান গণপরিষদে' যোগদানের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর পরিষদকে আবার দুই 'অংশে' বিভক্ত করা হয় এবং ১৫ মিনিট পরে অধিবেশন পুনরারম্ভ করা হয়।

পুনরারম্ভ অধিবেশনে প্রেসিডেণ্ট, পরিষদ বাংলার বিভক্তি সমর্থন করে কিনা তা পরিষদের ভোটের জন্য উত্থাপন করেন। ১০৬ জন সদস্য বিভাগের বিরুদ্ধে ও ৩৫ জন সমর্থনে ভোটদান করেন। ডেপুটি স্পীকার জনাব টি, আলী বিলম্বে আসেন ব'লে প্রস্তাবের উপর ভোটদানে অসমর্থ হন।

সভাপতির উত্থাপিত দ্বিতীয় প্রস্তাবটি ছিলো পরিষদ 'বর্তমান গণপরিষদে' যোগদানে ইচ্ছুক কিনা সে-প্রশ্নে। ১০৭ জন সদস্য যোগদানের বিরুদ্ধে ও ৩৪ জন স্বপক্ষে ভোটদান করেন।

তারপর ১০৫-৩৬ ভোটে সিলেটের পূর্ব পাকিস্তানভুক্তির সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কমিউনিস্ট সদস্যরা নিরপেক্ষ থাকেন।

পরিষদের অধিবেশনে একটা খুবই কৌতুককর ব্যাপার ঘটে এই যে, মুখ্যমন্ত্রী জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী, জনাব হাসান ইস্পাহানী,

জনাব খাজা নূরুদ্দীন ও জনাব আবুল হাশিমের মতো বিশিষ্ট মুসলিম লীগ সদস্যরা আসন গ্রহণ করেন পশ্চিম বাংলা গ্রুপে এবং যথাক্রমে কংগ্রেস দলের নেতা ও উপনেতা শ্রী কিরণশঙ্কর রায় ও ধীরেন মুখার্জী আসন গ্রহণ করেন পাকিস্তান গ্রুপে। দুইজন মুসলিম মহিলা সদস্যার মধ্যে একজন, মিসেস এম, এ, হাকাম বসেন পশ্চিম বাংলা গ্রুপে, কিন্তু অপরজন মিসেস আনোয়ারা খাতুন বসেন পূর্ব বঙ্গ গ্রুপে।

'বাংলার পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত'—
—সোহরাওয়ার্দী

বাংলা বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর সেদিনই এ-সম্পর্কে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁর প্রতিক্রিয়া জানান সংবাদ-পত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতির মাধ্যমে। বিবৃতিতে জনাব সোহরাওয়ার্দী বলেন :

"আশা নিরাশার যন্ত্রনার ইতি হল অবশেষে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র আদর্শের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। বাংলাকে দ্বিধাবিভক্ত করা হবে অচিরেই। মুসলিম বাংলার ক্ষোভের বিশেষ কারণ নেই। আমরা অবিশ্যি চেয়েছিলাম একটা সুষম ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র, যেখানে আমরা স্ব-নির্ভর হয়ে আমাদের সম্পদের সদ্ব্যবহার ক'রে বিশ্বের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধিশালী জাতি গ'ড়ে তুলতে পারতাম। কিন্তু সেই লক্ষ্যের পথে যুক্তভাবে এগিয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

"মুসলিম বাংলাকে এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই তার অমিত সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ঈপ্সিত লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতে হবে। পাকিস্তানের একটি অংশ হিসেবে তার খাদ্যসম্ভার পর্যাপ্ত হবে। পাটের উৎপাদক হিসেবে বিশ্ব হবে তার পদানত। তার শৈল্পিক ভবিষ্যৎ নিরাপদ।

"পাকিস্তানের আইন সভায় মুসলিম বাংলা শক্তিশালী ভূমিকার অধিকারী হবে। পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক বিকাশ, নীতি নির্দ্ধারণ ও সমৃদ্ধি সাধনের ক্ষেত্রে সে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। হিন্দুস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের পরগাছা হ'য়ে আর থাকতে হবেনা আমাদের। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, অস্পৃশ্যতার ছুঁৎগ্রস্ত যে জাতির আন্তর্জাতিকতাবাদ একটি ভনিতামাত্র এবং যে জাতির এশিয়ার নেতৃত্বের খোলস একটি ভড়ংমাত্র, তেমন একটি জাতির অংশ হওয়ার চাইতে আপন সত্তার স্বাতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েই আমরা বেশী সমাদৃত হতে পারবো বিশ্বের দরবারে। তার কারণ আমাদের অনস্বীকার্য রাজনৈতিক গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক সম্পদ।

"ভারত বিভক্ত হলেও, হিন্দু ও মুসলমানদের আগের মতোই মিলেমিশে থাকতে হবে; শুধু জনগণের কল্যাণের খবরদারী করার দায়িত্বের ভার পড়েছে নতুন লোকেদের কাঁধে।

"কাজেই এক্ষণে আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যালঘুদের স্বার্থসংরক্ষণ, এবং নিরাপত্তার ও ধর্ম-সংস্কৃতি নির্বিশেষে সকল মানুষের ভোগ্য অধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তাবিধান করার উদ্দেশ্যে সমঝোতা ও মতৈক্যে উপনীত হবার উপায় নির্ধারণ।

"আমাদের পথ আলাদা হয়ে গেছে। চলুন আমরা পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্বের ভাব বজায় রেখেই আমাদের পৃথক পৃথক পথে এগিয়ে যাই এবং প্রতিহিংসার মনোভাব পোষণ ও প্রতিপক্ষকে পদানত ক'রে কৃপাভিক্ষায় বাধ্য করার হুমকি প্রদর্শন থেকে বিরত হই।"

লীগের তিন কমিটি

বাংলা বিভাগের ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার মোকাবেলার উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ২১শে জুনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তিনটি কমিটি নিযুক্ত করেন। কমিটিগুলি ও তাদের সদস্যরা হচ্ছেন:

সীমানা নির্ধারণ কমিটি ঃ চেয়ারম্যান—জনাব মওলানা মুহম্মদ আকরম খান। সদস্য—জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী, জনাব নূরুল আমীন, জনাব তমিজুদ্দীন খান, জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী, জনাব রাগীব আহসান ও জনাব ফজলুর রহমান (সেক্রেটারী) (অতিরিক্ত সদস্য কো-অপ্ট করার ক্ষমতাসহ)।

সম্পদ কমিটি ঃ চেয়ারম্যান—জনাব নূরুল আমীন। সদস্য—জনাব এম, এ, এইচ ইস্পাহানী, জনাব মোয়াজ্জেমুদ্দীন হোসেন, জনাব নূরুল হক চৌধুরী, জনাব এস, জামান, জনাব শামসুদ্দীন আহমদ, জনাব আবদুল্লাহ আল-মাহমুদ, জনাব জসীমুদ্দীন আহমদ, জনাব হামিদুল হক চৌধুরী (সেক্রেটারী) (অতিরিক্ত সদস্য কো-অপ্ট করার ক্ষমতাসহ)।

সিলেট গণভোট কমিটি ঃ চেয়ারম্যান—জনাব মওলানা মুহম্মদ আকরম খান। সদস্য—জনাব আবদুল্লাহেল বাকী, জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী (সেক্রেটারী), জনাব গিয়াসুদ্দীন পাঠান, ডঃ এম, এ, মালেক, জনাব মফিজুদ্দীন আহমদ, জনাব আই, এ, মোহাজির ও বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্রলীগের সেক্রেটারী (অতিরিক্ত সদস্য কো-অপ্ট করার ক্ষমতাসহ)।

মওলানা ভাসানীর মুক্তিলাভ

২১শে জুন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী গৌহাটি জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন। আসামের বরপেটায় সংরক্ষিত চারণক্ষেত্রের বহির্ভাগে বিনাদোষে মুসলিম মোহাজেরদের উপর গুলিবর্ষণ করে ৭০ বৎসর বয়স্কা জনৈক মহিলাসহ ১২ জনকে নিহত করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও আন্দোলন শুরু করার ফলে পূর্ববর্তী মার্চ মাসে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিলো। মওলানা ভাসানী তখন আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন।

ডঃ ঘোষ কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা নির্বাচিত

২২শে জুন ডঃ পি,সি, ঘোষ প্রস্তাবিত পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশের কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা নির্বাচিত হন। কলকাতার কুমার সিং হলে কংগ্রেস সদস্যের বৈঠকে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আচার্য কৃপালনী বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

পাঞ্জাব দ্বি-খণ্ডিত

২৩শে জুন পাঞ্জাব আইন পরিষদে প্রদেশের অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী অংশের বৈঠকে ৫০-২২ ভোটে পাঞ্জাব বিভক্তিকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবিশ্যি প্রদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহের প্রতিনিধিদের বৈঠকে ৬১-২৭ ভোটে 'যুক্ত পাঞ্জাব প্রস্তাব' গৃহীত হয়েছিলো।

দেওয়ান বাহাদুর এস, পি, সিংয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যুক্ত অধিবেশন ৯১-৭৭ ভোটে নয়া গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমর্থনকারী ৯১টি ভোটের মধ্যে ৮৮টি মুসলিম, ২টি ভারতীয় খৃষ্টান ও ১টি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভোট। বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন হিন্দু শিখ ও তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যরা।

অমুসলিম সংখ্যাগুরু জেলাসমূহের প্রতিনিধিদের বৈঠকে যে ৫০ জন সদস্য পাঞ্জাব বিভাগের স্বপক্ষে ভোট দেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ৮ জন ইউনিয়ন দলভুক্ত মুসলিম সদস্য (খিজির হায়াত খান তিওয়ানার অনুগামীরা)।

লীগের সিদ্ধান্ত—

ঢাকা হবে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী

২৭শে জুন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি পূর্ব-পাকিস্তানের অস্থায়ী প্রশাসনিক সদর দফতর ঢাকায় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। চূড়ান্ত ফয়সালা হবার আগেই কলকাতার উপর দাবী

শিথিল ক'রে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় বিভিন্ন মহল ওয়ার্কিং কমিটির বিচক্ষণতায় সংশয় প্রকাশ করেন। যদিও মুসলিম লীগ ঘোষণা করেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্ত কোনক্রমেই পূর্ব পাকিস্তানের অংশরূপে কলকাতার উপর মুসলমানদের দাবী পরিহারের সমতুল্য বলে গণ্য করা যাবে না, তবুও সমালোচকেরা এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলে পারেন নি।

সিলেট
পূর্ব-পাকিস্তানে যোগদানের সিদ্ধান্ত

সিলেটের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ৬ ও ৭ই জুলাই গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। সিলেটের জনগণ বিপুল সংখ্যাধিক্য ভোটে পূর্ব-পাকিস্তানে যোগদানের স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

একটি নতুন জাতির জন্ম

পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের আবির্ভাব হলো ১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭। পূর্ব বঙ্গকে নিয়ে গঠিত হলো তার পূর্বাঞ্চল। কিন্তু লাহোর প্রস্তাবের ছায়াটুকু পর্যন্ত পড়তে পারেনি নবসৃষ্ট এই রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মুকুরে, কেননা বিভাগোত্তর দিনগুলোতে বরাবর এই প্রস্তাবকে পাশ কাটিয়ে চলা হয়েছে সযত্নে। দূর-বিক্ষিপ্ত দুই অঞ্চলের সমন্বয়ে গঠিত এই দেশ যা' কিছু শাসনতান্ত্রিক কাঠামো লাভ করেছে তা পুরোপুরিই আমাদের পুণ্যশ্লোক সংসদীয় রাজনীতি বিশারদদেরই নিজস্ব মস্তিষ্কপ্রসূত, আর এই মস্তিষ্কগুলোর অধিকাংশেই কোন বিবেকের বালাই ছিলো বলে মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। জন্ম থেকে আজ অবধি পাকিস্তানে একটি সাধারণ নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়নি, কাজেই লাহোর প্রস্তাবকে পাশ কাটিয়ে জাতির ভাগ্য নির্ধারণের জন্য কারুই কোন এখতিয়ার কিংবা জনগণের অনুমোদন লাভের প্রশ্নই ওঠে না।

সত্যনিষ্ঠ ও বিবেকসম্পন্ন কোন ব্যক্তিই স্বীকার না করে পারবেন না যে—(ক) লাহোর প্রস্তাবটিই ছিলো তার ব্যতিক্রমহীন সমগ্রতায় জাতির, বিশেষতঃ পূর্ব বাংলার জনগণের ম্যাণ্ডেট, কারণ ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বঙ্গের জনগণ সমস্বরে বজ্রকণ্ঠের আওয়াজ তুলেছিলেন এই প্রস্তাবেরই সমর্থনে এবং (খ) ১৯৪৬ সালের এপ্রিলে দিল্লীতে লেজিসলেটর্স কনভেনশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তা কোনক্রমেই লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনী সূচক ছিলো না, বরং পাকিস্তানের নিজস্ব সংবিধান রচনার জন্য একটি পৃথক গণপরিষদ গঠনই শুধু ছিলো এই (দিল্লী) প্রস্তাবের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য, আর প্রস্তাবে উল্লিখিত 'নিজস্ব সংবিধানটি' স্পষ্টতঃই লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই রচিত হবার কথা, কারণ লাহোর প্রস্তাব তখন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর জনগণের ম্যাণ্ডেটের মর্যাদা লাভ করেছে। পৃথক গণপরিষদ গঠনের মধ্য দিয়েই ১৯৪৬ সালের প্রস্তাবের (দিল্লী প্রস্তাবের) উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তারপরে আর এই প্রস্তাবের কোন কার্যকারিতা অবশিষ্ট থাকে নাই। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি জনগণকে ও তাঁদের ম্যাণ্ডেটকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করতে না চাইতেন, তাহলে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম-লাভের অব্যবহিত পর মুহূর্তে তাঁদের কর্তব্য হতো পরম ঐকান্তিকতার সাথে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই একটি সংবিধান রচনায় ব্রতী হওয়া, কারণ জনগণ অন্য কোন প্রকারের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর স্বপক্ষে নির্দেশ দান করেন নি। কিন্তু তাঁরা তা' করলেন না। জনগণের উপর আস্থা রেখে যদি তাঁদের মতামত যাচাইয়ের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো তাহলে পরিস্থিতি আজ সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে দাঁড়াতো। সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান না করার ফলেই শুরু হয় ষড়যন্ত্রের রাজনীতি, আর এই রাজনীতির শিকার হ'য়ে পড়েন জনগণ ও তাঁদের স্বার্থে যাঁরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হন তাঁরা। সঙ্কট উত্তরণের আর কোন বিকল্প পথ যখন অবশিষ্ট ছিলো না; তখন পূর্ব-পাকিস্তানের সোহরাওয়ার্দী ও ফজলুল হকের মতো মহাপ্রাণ জননায়কেরা গভীর

অন্তর্দৃষ্টির সংগে যারা চুক্তির আকারে একটি সমঝোতায় উপনীত হবার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সম্মতি আদায়ে সক্ষম হন। শান্তি-সম্প্রীতি ও পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে সহাবস্থানই ছিলো এ সমঝোতার লক্ষ্য। কিন্তু এই আস্থাও বাস্তবের কঠোর পরীক্ষার ধোপে টিকতে পারেনি। গণপরিষদের অঙ্গনে প্রথম সুযোগেই বিশ্বাসভঙ্গ করা হয়, আর এই বিশ্বাসভঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের কতিপয় রাজনীতিক সেই ভূমিকাই পালন করেছিলেন যা' তাঁরা ও তাঁদের সমগোত্রীয় পূর্বসূরীরা পালন করেছিলেন স্বাধীনতার প্রাক্কালে জনাব সোহরাওয়ার্দী র বিরুদ্ধে।

রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এ যাবৎ অনেক কিছুই বলা হয়েছে এবং অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করা হয়েছে। কিন্তু তাতে ফলোদয় হয় নাই কিছুই। এখন জাতির ইতিহাসে আসন্ন প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পূর্বাহ্নে আবার বাকবিতণ্ডার ঝড় উঠেছে লাহোর প্রস্তাবকে কেন্দ্র ক'রে। এ-কথা পুনরুক্তির অপেক্ষা রাখে না যে, জাতির আজকের এই সঙ্কটের জন্য লাহোর প্রস্তাবের প্রতি বিভাগোত্তরকালীন বিশ্বাসঘাতকতাই দায়ী। দিল্লী প্রস্তাব ও বৃটিশ সরকারের ৩রা-জুন পরিকল্পনা এ দু'য়ের কোনটিতেই দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই। জনগণ কর্তৃক পূর্বাহ্নে অনুমোদিত একটি প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ছাড়া একটি জাতীয় আবাসভূমি রচনার কথা চিন্তাই করা যায় না, আর আমাদের ক্ষেত্রে বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে এমন একটি কাঠামো শুধু লাহোর প্রস্তাবেই সুস্পষ্টভাবে সন্নিবেশিত ছিলো, এবং এই লাহোর প্রস্তাবের প্রতিই জনগণ পূর্ণ অনুমোদন দান করেছিলেন ১৯৪৬ সালে, গণভোট নামধেয় সর্বজন-স্বীকৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

আমাদের জাতীয় আবাসভূমি লাভের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কয়েক-মাসের প্রায় দৈনন্দিন যে ঘটনাপঞ্জী ও দলিল দস্তাবেজ পেশ করা হলো তার ভিত্তিতে পাঠক দেখতে পাবেন, এমন কি ১৯৪৬

সালের দিল্লী প্রস্তাব গৃহীত হবার পরেও আমাদের নেতারা ও তৎকালীন মুসলিম লীগ পত্রিকাগুলি একমাত্র লাহোর প্রস্তাবের নামেই শপথ নিতেন, এই প্রস্তাবের কথাই বলতেন এবং এই প্রস্তাবের আশ্বাসবাণীই জনগণকে শোনাতেন, অন্য কোন প্রস্তাবের নয়। দেশ ও জাতির সত্যিকারের দরদী কোন ব্যক্তি বা দলের সঠিক রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভংগী কি হওয়া উচিত তা জনগণেরই বিবেচ্য। তবে এই মুহূর্তে কর্তব্যের আহ্বান হচ্ছে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়গুলো স্মৃতিরপটে ভাস্বর করে তোলা এবং আর কালক্ষেপ না করে জনগণের আশা আকাঙ্খা বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হওয়া। ভুলে গেলে চলবে না যে, ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অবলীলায় শত নটের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটতে পারে। কিন্তু ইতিহাস কথা কয়ে যাবে নিরন্তর।

একটি প্রেক্ষিত—সমীক্ষা :
বিভাগোত্তর কাল

লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যে গৌরবময় আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন এবং বাংলার সার্বভৌম সংহতি ও অখণ্ড সত্তা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জনাব আবুল হাশিম যার প্রতি পূর্ণ সমর্থন দান করেছিলেন, ইতিহাসের সেই অবিস্মরণীয় অধ্যায়ের এইভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটলো ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্দ্ধে উঠতে না পেরে। বাংলার হিন্দুরা পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করলেন এই আন্দোলনের ; জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানবতার সেবার মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই আন্দোলনের হোতা হয়েছিলেন যিনি, তাঁর বিরুদ্ধেই তাঁরা লাগলেন মরিয়া হয়ে। সে অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, এবং ঘটেছে চিরকালের জন্যই। কিন্তু, আমাদের এই প্রিয় আবাসভূমির অঙ্গবৈকল্যের জন্য আমাদের মুসলিম লীগ নেতারাও কিছু কম দায়ী ছিলেন না।

মুসলিম বাংলাকে তার প্রিয় মাতৃভূমির একটি বৃহৎ অঙ্গচ্ছেদনের প্রবঞ্চনামূলক প্রক্রিয়াটি গভীর ক্ষোভের সংগে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিলো নীরব দর্শকের মতো, যদিও অপর কয়েকটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ বা অঞ্চলের ভাগ্য নির্দ্ধারণ করা হয়েছিলো অন্যতর প্রক্রিয়ায়।

আমাদের কতিপয় নেতা প্রিয় মাতৃভূমির ঐক্য সংরক্ষণের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করবেন বলে যত গলাবাজিই করে থাকুন না কেন, বাস্তব ঘটনার সাক্ষ্য তার বিপরীত। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কর্ণধার হিসেবে যে মওলানা মুহম্মদ আকরম খান বজ্র নির্ঘোষে ঘোষণা করেছিলেন যে, মুসলিম বাংলা লৌহদৃঢ় সঙ্কল্পের সাথে এর প্রতিরোধ করবে' এবং 'মুসলিম বাংলার মৃতদেহের উপরেই শুধু বাংলাকে বিভক্ত করা যাবে' সেই মওলানাকেই মোক্ষম লগ্নে তাঁর কড়ে আঙ্গুলটিও নাড়তে দেখা

যায়নি। শুধু তাই নয়, সবকিছু মিটমাট হবার আগেই লীগের যে কয়জন নেতা কলকাতা ছেড়ে ঢাকার পথে পাড়ি জমিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। বাংলা মুসলিম জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সালারে সুবা জনাব আই, এ, মোহাজির মুসলিম বাংলার 'শেষ সৈনিক ও শেষ রক্তবিন্দু' দিয়ে বিভাগ প্রচেষ্টা প্রতিরোধের 'সঙ্কল্প' ঘোষণা করেছিলেন এবং আরও হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন যে 'কালের চক্রে ইতিহাসের ঘটনার পুনরাবর্তন ঘটবে ; মাত্র ১৭ জন মুসলমান যদি গোটা বাংলাদেশ জয় করতে পারে, তাহলে বাংলার কয়েক কোটি মুসলমানের পক্ষে তাদের নিজের দেশ নিজের অধিকারে রাখা অসম্ভব হবে না'। কিন্তু বাংলা বিভাগের অকুস্থলে এই মোহাজির সাহেবের কাল্পনিক টিকিটিও দেখা যায়নি, কিংবা ধর্মান্ধ হিন্দুদের অশুভ চক্রান্ত নস্যাৎ করার জন্য রণক্ষেত্রে তাঁর অযুত যুযুধন বাহিনীরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি।

তবে বাংলার মাটিতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছিলো নিঃসন্দেহে। কিন্তু সে জনাব মোহাজির কথিত পন্থায় নয়, ১৭৫৭-এর পলাশী প্রান্তরের পন্থায়। আর তখন থেকে আজ অবধি আমাদের জাতীয় জীবনের এই ২৩ বছরের ইতিহাসে বাংলার মাটিতে বাংলার মানুষেরা অনেক সংগ্রামেই অবতীর্ণ হয়েছে ; জাতির পিতা ও মুসলিম লীগের ১৯৪০ সাল থেকে প্রতিশ্রুত সকল অধিকার ও সুবিধা আদায়ের জন্য। কিন্তু এ-সব সংগ্রামই ব্যর্থ হয়েছে শক্তি ও নিষ্পেষনের জগদ্দল পাথরে চাপা পড়ে।

জনাব সোহরাওয়ার্দীর ভাষায়, 'আমাদের পথ আলাদা হয়ে গেছে' এবং এই আলাদা পথের মিলন আর ঘটবার নয়। কিন্তু, স্বাধীনতা লাভের পূর্ব মুহূর্তে যে নেতারা জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বের বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের জিগ্যেস করতে পারি কি ; তাঁর আরাধ্য মুসলিম বাংলার স্বপ্নের কি গতি হলো ? বাংলা বিভাগের প্রাক্-মুহূর্তে প্রদত্ত বিদায়ী ভাষণে জনাব সোহরাওয়ার্দী মুসলিম বাংলার ভবিষ্যতের চিত্র

অঙ্কন করতে গিয়ে দেখিয়েছিলেন যে, মুসলিম বাংলা হবে পাকিস্তানের এমন একটি অংশ যেখানে খাদ্যসম্ভার হবে পর্যাপ্ত এবং পাটের উৎপাদক হিসাবে 'বিশ্বের বাজার হবে যার পদানত; যার 'শৈল্পিক ভবিষ্যৎ' 'নিরাপদ'। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, পাকিস্তানের আইন পরিষদে 'মুসলিম বাংলা' শক্তিশালী ভূমিকার অধিকারী হবে এবং 'শাসনতন্ত্র সংরচনে, নীতি নির্দ্ধারণে ও পাকিস্তানের সমৃদ্ধিসাধনে সে তার বিশিষ্ট ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।'

মুসলিম বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে চল্লিশের দশকে এই ছিলো তাঁর স্বপ্নসাধ। কলকাতার হ্যারিংটন স্ট্রীটে জনাব ইস্পাহানীর বাসভবনের সবুজ-ঘেরা অঙ্গনে বসে ১৯৪৬ সালের এক অন্তিম সায়াহ্নের প্রদোষে জাতির পিতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও দেখেছিলেন মুসলিম বাংলার এই স্বপ্নচিত্র। সেই চল্লিশ দশকের মধ্যভাগে কায়েদে আজমের হৃদয় ব্যথাতুর হয়েছিলো দেশের এই অংশের তাঁর ভাইদের দুর্দশায়, সেদিন তিনি নীরবে অশ্রুপাত করেছিলেন 'জঠরজ্বালায় ক্ষীণ, কৃশ, হাড়-জিরজিরে' মুসলিম বাংলার করুন চিত্র দেখে। রোমের ভস্মীভূত হবার সময় নীরোর গর্বোদ্ধত বংশীবাদনের মতো, বিভাগোত্তর কালে এই চিরবুভুক্ষায় মুমূর্ষু মুসলিম বাংলার প্রতি আমাদের নীরোদের ঔদাসীন্য কি কলঙ্কজনক নয়? সত্তর দশকের বাংলার চিত্র কি কায়েদে আজমের অঙ্কিত চল্লিশ দশকের বাংলার চিত্রের চাইতে কোন অংশে উজ্জ্বলতর? ৭ই মে, ১৯৪৭ সংখ্যা মর্ণিং নিউজের ভাষায় বলা যায় 'বিবেক ও দূরদৃষ্টিহীন অসৎ ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউই' এর জবাবে 'হাঁ' বলতে পারে না।

প্রকৃতপ্রস্তাবে বিভাগোত্তরকালে বাংলার অবস্থার যে আরো অবনতি ঘটেছে এ-কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। একমাত্র স্বার্থ-সন্ধানী ব্যক্তিরাই বাস্তবের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে বিশ্বের চোখে ধূলো দেবার অপচেষ্টা করে এসেছে এবং করছে। তারই প্রত্যক্ষ ফল হালের

এই শাসনতান্ত্রিক সমস্যাজনিত বিভ্রান্তি। কিন্তু দেশ ও জাতির কল্যাণ-ভবিষ্যতে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তিই ইতিহাসের শিক্ষাকে উপেক্ষা করতে পারেন না। পেছনের পাতাগুলিতে আমাদের ইতিহাসের যে রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি তা' থেকে চক্ষুষ্মান পাঠকমাত্রই অনুধাবন করতে পারবেন—যে বঞ্চনার ও প্রতিশ্রুতিভঙ্গের নিশ্ছেদ ইতিবৃত্ত এর আগাগোড়া জুড়ে আছে তাই হচ্ছে আমাদের আজকের রাজনৈতিক সমাজদেহের সকল ব্যাধির মৌল নিদেন।

পাকিস্তানের ভিত্তিস্বরূপ লাহোর প্রস্তাবটি পরে ১৯৪৬ সালের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত লেজিসলেটর্স কনভেনশনে সংশোধন করা হয়েছিলো বলে যাঁরা দাবী করেন, তাঁদের কাছে বাংগালীদের জিজ্ঞাস্য: দিল্লী প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিলো ১৯৪৬ সালের ৯ই এপ্রিল তারিখে, কিন্তু তারপরে কেউ আর কোনদিন শুনেছে এর কথা? যদি সত্যি লাহোর প্রস্তাব সংশোধিত ও সারবত্তাহীন হয়ে থাকে, তাহলে একাধারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ প্রধান জনাব মওলানা আকরম খান ও তাঁর পত্রিকা দৈনিক আজাদ এবং খাজা পরিবারের মালিকানাধীন দৈনিক মর্ণিং নিউজ এমনকি ১৯৪৭ সালের দিনগুলোতেও কেন এই লাহোর প্রস্তাবের নামেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে থাকেন? স্মর্তব্য যে, সেই যুগে কেবল এই দুইটি পত্রিকাই ছিলো বাংলাদেশে মুসলিম লীগের সমর্থক কাজেই তাদের এবং তৎসহ প্রাদেশিক লীগ প্রধান জনাব মওলানা আকরম খানের মতকেই জনসাধারণ আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম লীগের মত বলেই ধরে নিতেন। আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই 'আজাদ'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধের উদ্ধৃতিদান থেকে বিরত থেকেছি, কারণ পত্রিকাটির মালিক জনাব মওলানা আকরম খানের বক্তৃতাবিবৃতির ব্যাপক উদ্ধৃতির পর পত্রিকার মতামতের উদ্ধৃতি অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। কায়েদে আযমের প্রতি জনাব সোহরাওয়ার্দীর মনোভাব সম্পর্কে সমালোচকেরা সংশয় প্রকাশ করতে পারেন, কিন্তু জাতির পিতার প্রতি জনাব মওলানা সাহেবের ও খাজা পরিবারের অনুরাগ সম্পর্কে নিশ্চয়ই কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে না।

ঐতিহাসিক দলিলের সাক্ষ্য থেকেই জানা যাবে যে, দিল্লী প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিলো ১৯৪৬ সালের এপ্রিলে, আর এদিকে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান জনাব সোহরাওয়ার্দীর ঐক্য প্রচেষ্টাকে বানচাল করার কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায়ই ১৯৪৭ সালের ৫ই মে ঘোষণা করেন "মুসলিম বাংলা ১৯৪০ সালের সুবিদিত লাহোর প্রস্তাবে নির্দেশিত আদর্শের প্রতি অবিচলিত রয়েছে" এবং ১৯৪৭ সালের ১৯শে মে আরেক ঘোষণায় মওলানা সাহেব জানান: "অখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবে উল্লেখিত পরিকল্পনার সংগে সামঞ্জস্যহীন কোন প্রস্তাব" তিনি সমর্থন করিতে পারেন না। খাজা পরিবারের বাহন মর্ণিং নিউজও জনাব মওলানা সাহেবের প্রতি এই প্রশ্নে জোর সমর্থন জানান।

কাজেই এ-সত্যটি খরতাপে দীপ্ত মধ্যাহ্ন দিনের সূর্যালোকের মতোই স্পষ্ট যে, লাহোর প্রস্তাবটি অপরিবর্তিত ও অসংশোধিত আকারেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের মৌল ভিত্তিরূপে বিবেচিত হয়েছে এবং এ কারণেই এ প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান প্রস্তাব বলে স্বীকৃতি-লাভ করে।

ইদানীং আরেক দল নতুন ভাষ্যকারের উদয় হয়েছে। তাঁরা স্থানীয় একটি ইংরেজী দৈনিকের স্তম্ভের উপর ভর করে এক নতুন ভাষ্যের আমদানী করেছেন। এই নবোদ্ভিন্ন স্তম্ভকের দল লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের অঞ্চল ও প্রদেশসমূহের জন্য যাঁরা স্বায়ত্তশাসন দাবী করেন তাঁদের কুপোকাৎ করার জন্যে একেবারে উঠে পড়ে লেগেছেন। এঁরা তাঁদের সমধর্মা পূর্বসূরীদেরও এককাঠি উপরে উঠে দাবী করছেন যে, আমাদের নেতারা বৃটিশ সরকারের ৩রা জুন পরিকল্পনা মেনে নেয়ার ফলে লাহোর ও দিল্লী উভয় প্রস্তাবই বাতিল হয়ে গেছে এবং সেহেতু 'পরিবর্তিত অবস্থার' সংগে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য আমাদের পার্লামেণ্টারী রাজনীতিকেরা একটি

যথোপযুক্ত শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য নতুন করে ভাবতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই ধরণের তত্ত্ব উত্থাপন বালসুলভ মানসিকতার প্রকাশমাত্র, এবং এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে অতীতের মতো আবার জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে তাঁদের ধাপ্পা দেয়া।

এই ধাপ্পাবাজির প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করে আমাদের শাসন-তান্ত্রিক সমস্যার জটিলতা নিরসন ও একটি সুষ্ঠু সমাধান নির্ণয়ের পথ নির্দেশের জন্য প্রয়োজন আমাদের ইতিহাসের অবশিষ্ট অংশের সার-সঙ্কলন। এ যাবৎ আমরা শুধু আমাদের প্রাক-বিভাগ অতীতের উপরই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছি। এবার চলুন, দেখি আমাদের বিভাগোত্তর ইতিহাসের বাণী কি। এই বাণীর যত্নবান শ্রোতা অবিশ্যি লক্ষ্য করবেন যে, দেশবিভাগের অব্যবহিত পরেই আমাদের শাসন-তান্ত্রিক প্রশ্নাবলীতে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দলের যথেচ্ছাচারী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে ঐক্যতানে বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলেছিলো পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। ১৯৪৮ সালেই এই প্রতিরোধের আওয়াজ তুলেছিলেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ। পরের বছরই ১৯৪৯ সালে তাঁদের ধ্বনিটিরই প্রতিধ্বনি তোলেন নবগঠিত বিরোধী দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি সংবিধান রচনাই হয় তাঁদের কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য। (পরিশিষ্ট—ছ দেখুন)।

১৯৫০ সালে নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান গণপরিষদে মূলনীতি সাব-কমিটির রিপোর্ট পেশ করার পর এই রিপোর্টের সুপারিশ গুলোর বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে তুমুল গণআন্দোলন শুরু হয়ে যায়। সে বছরই ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরী হলে জনাব আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে একটি গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল কনভেনশন আহূত হয়। জনাব খানের আকস্মিক অসুস্থতার পর আহ্বায়ক

জনাব কামরুদ্দীন আহমদ কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন। কনভেনশনে যোগ দেয়ার জন্যে বাংলার প্রত্যেক জেলা থেকে প্রতিনিধিরা আসেন। এই প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন বার এসোসিয়েশন ও শিল্প-বাণিজ্য সমিতিসমূহের (চেম্বার্স) সদস্যরা, মুসলিম লীগের প্রাক্তন কর্মিগণ এবং বহু ছাত্রনেতা, কিষাননেতা, শ্রমিকনেতা, শিক্ষক ও সাংবাদিক।

কনভেনশনে শাসনতন্ত্র প্রণয়নকল্পে মূলনীতি নির্ধারণের জন্য ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি বিকল্প প্রস্তাব গৃহীত হয়। সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত কনভেনশনের এই প্রস্তাবে কেন্দ্রের হাতে মাত্র দুইটি বিষয় ন্যস্ত করা হয়, যথা: বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা, এই শর্তে যে:

(ক) ফেডারেল রাজধানীতে অবস্থিত সুপ্রীম কমাণ্ডের অধীনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে আঞ্চলিক জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিংসহ প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের দুইটি ইউনিট গঠন করতে হবে।

(খ) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের নিয়েই আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চল থেকেই সে বাহিনীতে লোকসংগ্রহ করতে হবে।

(গ) পূর্ব-পাকিস্তানে একটি আঞ্চলিক বৈদেশিক সম্পর্ক সংক্রান্ত দফতর স্থাপন করতে হবে।

(ঘ) অপর সকল ক্ষমতা অঞ্চলসমূহের হস্তে ন্যস্ত থাকবে।

করধার্যকরণ নীতি প্রসঙ্গে কনভেনশন এই মত প্রকাশ করেন যে, ফেডারেল সরকারের শুধু কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় ও বস্তুর উপরই কর ধার্য করার অধিকার থাকবে। ঘাটতি হলে সে ঘাটতি পূরণের জন্য অঞ্চলসমূহের অনুমতিসাপেক্ষে নতুন বিষয় ও বস্তু সংযোজন করা যাবে।

মোদ্দা কথায়, দেশের প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য কনভেনশন প্রায় একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া পেশ করেন। (বিস্তারিত বিবরণ দেখুন, পরিশিষ্ট —জ)।

জনাব লিয়াকত আলী খান পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সরেজমিনে তদন্ত করার উদ্দেশ্যে ঢাকা আসলে তাঁর কাছে কনভেনশনের প্রস্তাবগুলি পেশ করা হয়। পূর্ব-পাকিস্তানে তখন খুবই উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজমান ছিলো। প্রস্তাবগুলির অন্তর্নিহিত বাণী ছিলো এই যে, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হতে চায় না। জনাব লিয়াকত আলী খান পূর্ব পাকিস্তানের জনমতের দৃঢ়তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু এ কথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর নিজের রচিত যে রিপোর্ট তিনি পার্লামেণ্টকে উপহার দিয়েছিলেন সেটিকে শিকেয় তোলা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই, এবং অতঃপর তিনি শিকেয় তুলেই রাখেন সেটিকে।

তারপর ১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনকালেও লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে কেন্দ্রের হাতে মাত্র তিনটি বিষয় ন্যস্ত রেখে একটি সংবিধান রচনার দাবী যুক্তফ্রণ্টের ঐতিহাসিক ২১ দফা কর্মসূচীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। (পরিশিষ্ট—ঝ দ্রষ্টব্য)। যুক্তফ্রণ্টের তিনটি অঙ্গদল আওয়ামী লীগ, কৃষকশ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলাম সমভাবে এই দাবী আদায়ের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। নির্বাচনে বাংলার জনগণও তাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলো।

কিন্তু দাবীটি সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর বাংলার সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের ম্যাণ্ডেটে পরিণত হওয়া সত্বেও কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দল একে প্রতিরোধ করেন; এই দলটিই দেশের এই অংশের রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো সেই সাধারণ নির্বাচনে। তদুপরি, দেশের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশের আশার স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করার দুরভিসন্ধিতে জনাব এ, কে, ফজলুল

হকের নেতৃত্বাধীন পূর্ব-পাকিস্তানের যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করা হয় এবং নির্বাচনী মিত্রদের সমঝোতা ও ঐক্যের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করা হয়। কিন্তু তবু ১৯৫৭ সালে এই অঞ্চলের জন্য লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন দাবী করে একটি প্রস্তাব পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিলো। তা সত্ত্বেও তথা-কথিত পার্লামেণ্টারী নিয়মানুসারে প্রাদেশিক পরিষদের এই সর্বসম্মত রায় গণপরিষদে প্রত্যাখ্যাত হয়, এবং সেটাও সম্ভব হয়েছিলো শুধু পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সংগে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানী রাজনীতিকদের একটি গোষ্ঠীর আঁতাতের ফলে। অথচ এই বিশেষ গোষ্ঠীটিও ১৯৫৪ সালের মহান নির্বাচনী মৈত্রী জোটের অংশ হিসাবে ২১ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য জনগণের কাছে ওয়াদাবদ্ধ ছিলেন, আর এই কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান স্তম্ভই ছিলো লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন।

তারপর ১৯৫৯ সালে যে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিলো তার মাধ্যমে এই ইস্যুর চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য পূর্ব পাকিস্তানবাসী যখন দৃঢ় সংকল্পের সাথে প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলো তখন অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে শাসনতন্ত্র বাতিল করে সারা দেশের উপর সামরিক আইন চাপিয়ে দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান যখন ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জাতির কাছে তাঁর সুবিখ্যাত ৬ দফা কর্মসূচী পেশ করেন তখন স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন আবার নতুন ভাবে শক্তি সঞ্চয় করে। (দেখুন, পরিশিষ্ট—ঞ)। সেকালের প্রেসিডেণ্ট আইউব খান এর জবাব দেন 'জেহাদ', 'গৃহযুদ্ধ' ও 'অস্ত্রের ভাষার' হুমকি দিয়ে। এর পরের ইতিহাস ব্যাপক ধরপাকড়, নিষ্পেষণ, জনাব সোহরাওয়ার্দী ও ইত্তেফাক-সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনের নিগ্রহ, ইত্তেফাক প্রেসের বাজেয়াফতকরণ ও কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার

কলঙ্কিত অধ্যায় সকলেরই অল্পবিস্তর জানা আছে। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন (পি, ডি, এম, বলেই সমধিক পরিচিত) নামে আরেকটি আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনে ৬-দফা পন্থীদের সমর্থন ছিলো না। পি,ডি, এম, একটি ৮-দফা ফর্মুলার উদ্ভাবন করে দাবী করেন যে এটি ৬ দফা কর্মসূচী থেকে অনেক বেহেতর। (৮-দফা ফর্মুলার বিবরণ দেখুন, পরিশিষ্ট—ট)। যদিও ৬-দফা পন্থীদের মতে ৮ দফা ফর্মুলা 'এই প্রদেশের জনগণের সত্যিকার দাবী দাওয়ার উপরে কয়েক দফা আপোষ রফার প্রস্তাবনামাত্র' তবুও আইউব শাহীর প্রতিক্রিয়া এর প্রতি কিছু বেশী অনুকূল ছিলো না। আইউবের মুখপাত্র জনাব স্লেরীর ভাষায়, ৮ দফা 'মুজিবের ছয় দফা থেকেও দুই ধাপ নিকৃষ্ট' এবং সেহেতু ' দেশটা কি তার সংহতি অক্ষুন্ন রেখেই বেঁচে থাকবে, না পি, ডি, এম-এর ধনুর্ভঙ্গ প্রতিজ্ঞা অনুসারে ভেঙ্গে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে সে প্রশ্নটার একটা চূড়ান্ত ফয়সালা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।' অর্থাৎ, ন্যায়নীতির কাছাকাছি কোন প্রস্তাবনাও পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠী বরদাশ্‌ত করতে পারবে না।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলে আইউবের পতনের পর ইয়াহিয়া সরকার গদ্দীনসীন হন। পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে পি,ডি, এম, এর অঙ্গদলগুলি পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল (পি,ডি,পি বলে সমধিক পরিচিত) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে হাত মেলান। সাবেক পি,ডি, এম, এর ৮ দফার স্থলে পি,ডি,পি একটি নয়া 'মেনিফেস্টো' গ্রহণ করেন। তবে ৬ দফাপন্থীরা তাঁদের মূল দাবীতে অটল থাকেন এবং পুনর্বিবেচনা করতে অসম্মত হন। অপিচ, তাঁরা সাধারণ নির্বাচনের মারফৎ তাঁদের কর্মসূচীর উপর জনগণের রায় নেবার প্রস্তাব করেন, কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, জনগণই দেশের প্রকৃত মালিক এবং দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের আসল চাবিকাঠি জনগণেরই হাতে। এই পটভূমির উপর ভিত্তি করেই জাতি আসন্ন ৭ই ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনের সম্মুখীন হচ্ছে।

এ কথা এখন দিবালোকের মতোই স্পষ্ট যে, স্বায়ত্তশাসন দাবী কিছু অভিনব আবিষ্কার নয়। আমাদের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের চাইতেও প্রাচীন স্বায়ত্তশাসন দাবীর আদিসূত্র। আর এই স্বায়ত্তশাসন দাবী আজ পূর্ব বাংলার মানুষের প্রাণের বস্তু, কারণ এটি তাঁদের জীবন-মরণের প্রশ্ন। স্বাধীনতা লাভের পরে পরেই স্বায়ত্ত-শাসন বঞ্চিত এই প্রদেশের মানুষ দেখতে পেয়েছে তার অধিকারগুলোকে একের পর এক বলি দেয়া হয়েছে অপর অঞ্চলের অন্যায় স্বার্থের যূপকাষ্ঠে, তার মাতৃভূমিকে ধীরে ধীরে পরিণত করা হয়েছে সেই অপর অঞ্চলের উপনিবেশে। তাই আজ সে আরো দেখতে পাচ্ছে, চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর 'ভাইদের' যে দুর্দশা দেখে হুহু করে কেঁদে উঠেছিলো কায়েদে আজমের প্রাণ, সত্তর দশকে তাদের সেই দুর্দশা আরো বেড়েছে বৈ কমেনি।

আমাদের একশ্রেণীর তথাকথিত নেতারা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে রাষ্ট্র-ক্ষমতার মদিরার আস্বাদ লাভ ক'রে যেভাবে বারংবার দেশ ও জাতিকে পাশব নির্মমতার সাথে প্রতারিত করেছেন এবং পবিত্র কোরআনের নামে হলপ ক'রে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্রের' শাসনতন্ত্রের হেফাজত করবেন ও ইসলামের অনুশাসন অনুসারে দেশ শাসন করবেন বলে উড়ে এসে জুড়ে বসা যে রাষ্ট্রপ্রধান শপথ গ্রহণ করেছিলেন তিনি যেভাবে সেই শাসনতন্ত্রকেই কলমের এক খোঁচায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন সে অভিজ্ঞতার পটভূমিতে, একটি সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা নিরূপণ করে নতুন সলিলে রাষ্ট্রতরীর হাল সামলে না ধরা পর্যন্ত জনগণ সন্তুষ্ট হতে পারেন না। প্রজাতন্ত্রের এই অংশের নিঃস্ব জনগণকে যে সীমাহীন শোষণ ও নিপীড়নে নিরক্ত করা হয়েছে—এবং তাও করা হয়েছে ইসলামের নামেই—সে অপ্রিয় সত্যটিও উপেক্ষা করলে চলবে না। আমাদের কিছু সংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা ইসলামের নামে আরো যত নতুন নতুন কুযুক্তি ও

তত্ত্বই হাজির করুন না কেন, তা' দিয়ে আর পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ধোকা দেয়া সম্ভব হবে না। বরং তার ফল উল্টোই হবে, কারণ শান্তি ও ন্যায় বিচারের ধর্ম ইসলামকে অতীতে এই নেতারাই যেভাবে জনসাধারণকে ব্যাপক শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন জনগণের স্মৃতিপট থেকে সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা এখনো একেবারে মুছে যায়নি। ইসলাম গেল ব'লে জিগীর তুলে যাঁরা এই প্রদেশের জনগণকে তাঁদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত রাখার অপচেষ্টায় তৎপর, তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের গণমানসের সঠিক চরিত্র অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁদের অচিরে এই সত্যের সম্যক উপলব্ধি বাঞ্ছনীয় যে, পূর্ব পাকিস্তান ন্যায়সঙ্গত ভাবেই নিজেকে পাকিস্তানের স্রষ্টা বলে বিবেচনা করে, কারণ (ক) বাংলা দেশেরই ঢাকা নগরীর স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৯০৬ সালে, আর এই মুসলিম লীগেরই পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই উপ-মহাদেশের ১০ কোটি মুসলমান সংগ্রামের মধ্য দিয়েও বহু ত্যাগের বিনিময়ে পাকিস্তান অর্জন করেন ; (খ) এই বাংলারই বরিশালবাসী শেরে বাংলা জনাব এ, কে, ফজলুল হক আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান প্রস্তাব ব'লে স্বীকৃত লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, আর এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই দেশ বিভাগ ইস্যুর উপর ভারতের দশ কোটি মুসলমানের রায় গ্রহণ করা হয়েছিলো ; (গ) বাংলাদেশেরই মহানগরী কলকাতার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৬ সালের লেজিসলেটর্স কনভেনশনে দিল্লী প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, আর এই প্রস্তাবই ভিত্তি রচনা করে পাকিস্তানের জন্য একটি স্বতন্ত্র গণপরিষদের। (কিছু সংখ্যক লোক সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে এই প্রস্তাবকেই লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনী বলে জাহির করার চেষ্টা করেন) ; এবং (ঘ) ভূ-ভারতের মধ্যে বাংলাই ছিলো একমাত্র প্রদেশ যেখানে মুসলমানেরা শতকরা একশত জন মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের স্বপক্ষে ভোটদান ক'রে ১৯৪৬ সালের একমাত্র মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা উপহার দেন কায়েদে আজমকে। (পরে সিন্ধু প্রদেশেও একটি মুসলিম

লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হয়েছিলো, কিন্তু তা শুধু একটিমাত্র ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে।)

একথা সত্যি যে, বিকাশমান ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে বাংলার নেতারা পাকিস্তানকে একটিমাত্র অখণ্ড রাষ্ট্র হিসেবে গ'ড়ে তোলার নীতিতে সম্মত হয়ে আপোষ করেছিলেন। জনগণও এই আপোষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধ্বনি উত্তোলন করেননি, কারণ তাঁদের বিশ্বাস ছিলো যে লাহোর প্রস্তাবের আদর্শ অনুসারে তাঁদের প্রদেশ 'সার্বভৌম ও স্বায়ত্ত-শাসিত' হবে এবং সেহেতু দেশের এক অংশ অপর অংশের শোষণের শিকারে পরিণত হবার কোন অবকাশ থাকবে না। কিন্তু নবস্থ৷ জাতির বৃহত্তর অংশের এই মহানুভবতাকে কোন-ক্রমেই খোদ লাহোর প্রস্তাব বিসর্জনের সামিল বলে বিবেচনা করা সমীচীন হবে না। বড় জোর এতটুকু বলা যায় যে, এটি হচ্ছে এই ভিত্তিতে একটিমাত্র রাষ্ট্র গঠনে সম্মতিদান যে, সে-রাষ্ট্রের 'অন্তর্ভুক্ত ইউনিটগুলি স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম হবে।' বস্তুতঃ বাংলার মুসলমানেরা পরম আন্তরিকতা ও সরল বিশ্বাসের ভিত্তিতে এই সব আপোষ রফা মেনে নেয়া ছাড়াও আরও যে কয়টি বিশেষ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ত্যাগ স্বীকার করে তা হচ্ছে: (ক) পশ্চিম অঞ্চলের সংগে ১২০০ মাইলেরও বেশী ব্যবধান সত্ত্বেও পাকিস্তান ভুক্তিতে সম্মতিদান, (খ) জাতির পিতার জন্মভূমি করাচীকে দেশের রাজধানী হিসাবে গ্রহণ, (গ) গণপরিষদে নিজেদের ছয়টি আসন ত্যাগ করে সেগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের নির্বাচন (ঘ) সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার বিসর্জন করে সংখ্যাসাম্য গ্রহণ—যার ফলে প্রায় ১ কোটিরও বেশী লোক ভোটাধিকার বঞ্চিত হয় এবং এই অঞ্চল অনেক অর্থনৈতিক অধিকার ও বিশেষ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়; এবং (ঙ) দেশের অপর অঞ্চলে প্রতিরক্ষা বাহিনী ও প্রশাসনিক সদর দফতর স্থাপনে আপত্তি করেনি।

এই সব আত্মত্যাগ ও স্বার্থবিসর্জনের মাধ্যমে বাংলার জনগণ নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ করেছেন সুখী, সমৃদ্ধিশালী ও শক্তিশালী পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে ঐক্যবদ্ধ থাকার আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু তার পরিণাম কি হয়েছে? আমাদের জাতীয় জীবনের ২৩ বছরের ইতিহাস নির্মম শোষণ ও পৌনঃপুনিক প্রতিশ্রুতিভঙ্গের পূতিগন্ধময় একটি দলিল বৈ কিছু নয়, আর জনগণের মধ্যে পারস্পরিক আস্থাহীনতার কারণও এটাই। এই অঞ্চলের পাকিস্তান আন্দোলনের প্রধান হোতা ও জনগণের প্রিয় নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে যখন পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব বাংলার মাটিতে পদার্পণ করার অনুমতি দেওয়া হলো না। এবং গণপরিষদে ভারতীয় নাগরিক অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তীর সদস্যপদ বজায় রাখা সত্ত্বেও জনাব সোহরাওয়ার্দীর সদস্যপদ বাতিল করা হয় তখন বাঙ্গালীদের মনকে আর কি ব'লে প্রবোধ দেয়া যেতে পারে? ১৯৫৪ সালের যে-ঐতিহাসিক নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ সকল গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও প্রাদেশিক প্রশ্নে সুস্পষ্ট রায় দিয়েছিলো, সেই নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক শেরে বাংলা জনাব এ, কে, ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের মুহূর্ত থেকেই যেখানে লাঞ্ছিত হতে থাকেন চোখের সামনে তা' দেখে বাংলার মানুষ নিজের মনকে প্রবোধ দিতে পারে কি ব'লে? কিভাবে তাদের ক্ষুব্ধ মনে প্রশান্তির শীতল বারির পরশ বুলিয়ে দেয়া যাবে যখন তারা স্মরণ করে, কেমন করে তাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা ও বিভাগোত্তর পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর উদ্দেশ্যের সততার প্রমাণ দেয়ার জন্য একজন বিদেশী সংবাদদাতার মোকাবেলা করতে বাধ্য করা হয় এবং পরিশেষে ৩১শে মে তারিখে পাকিস্তান প্রস্তাবের উত্থাপকের মতো নেতার নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করা হয় ও বরখাস্ত মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য শেখ মুজিবর রহমানসহ বিপুলসংখ্যক যুক্তফ্রণ্ট কর্মীকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ঠেলে দেয়া হয়? এই ভাগ্যবিড়ম্বনার কারণ কি এই

ছিলো না যে, মাত্র একদিন আগে ২৮শে মে তারিখে জনাব ফজলুল হক জনগণের ম্যাণ্ডেটে সজ্জিত মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে করাচীতে প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী বোগরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবী উত্থাপন করেছিলেন? পূর্ব পাকিস্তানের দাবী দাওয়া প্রতিহত করার জন্য সঙ্কল্প বদ্ধ মনেরই কি একটা অভ্রান্ত প্রকাশ ছিলো না এই ঘটনা, এমন কি সে দাবী দাওয়ার আওয়াজ যদি সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে উত্থিত হয় তবুও?

ইতিহাসের পাতা উল্টাবার কষ্ট স্বীকার করলে যে কোন ব্যক্তি দেখতে পাবেন, মোট ৩০৫টির মধ্যে ২৩০টি আসনের অধিকারী যুক্তফ্রন্ট পরিষদ দলের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে * বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব এ, কে, ফজলুল হক করাচীতে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে বাংলার দাবী উত্থাপন করেন এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, মাত্র তিনটি বিষয়, যথা, প্রতিরক্ষা, মুদ্রাব্যবস্থা ও বৈদেশিক সম্পর্ক কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে দিয়ে আর সকল বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দান করতে হবে এবং অতঃপর প্রদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কেন্দ্র আর কোন অজুহাতেই হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবীতে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর এই ভূমিকাই কি ৩০শে মে তারিখে তাঁর পতন ও স্বগৃহে অন্তরীণ হওয়ার

* ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের দলভিত্তিক সদস্যসংখ্যা ছিলো :

যুক্তফ্রণ্ট----	২৩০	গণতন্ত্রী দল-------	২
তফসিলী ফেডারেশন--	২৬	বৌদ্ধ সম্প্রদায় ---	২
কংগ্রেস ---	২৪	খিলাফতে রব্বানী---	১
মুসলিম লীগ---	৯	খৃষ্টান---------	১
কমিউনিস্ট----	৫	স্বতন্ত্র বর্ণহিন্দু---	১
স্বতন্ত্র ---	৪	মোট	৩০৫

এবং প্রদেশের জনগণের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে নতুন মেঘের ঘন-ঘটার কারণ ছিলো না? কিন্তু শাসকচক্র জনাব ফজলুল হকের ৩০ শে মে প্রদত্ত এক বিবৃতিকে তাদের দুষ্কর্মের সাফাই হিসেবে ব্যবহার করে। এই বিবৃতিতে তিনি বলেন অথবা তাঁকে বলতে বাধ্য করা হয়ঃ

"এক অসতর্ক মুহূর্তে, সম্ভবতঃ উচ্ছ্বাসপ্রবণতার বশবর্তী হ'য়ে, আমি এমন সব কথা বলেছি যা আমার বলা উচিত হয়নি। যা বলেছি তা বলার উদ্দেশ্য আমার ছিলো না। সে মুহূর্তে আমি আমার উক্তির তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারিনি। পাকিস্তানের প্রতি আমার কোন অসদিচ্ছা নাই, পাকিস্তানের কোন ক্ষতি আমি চাই না। পাকিস্তানের প্রতি আমার আনুগত্যে সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে এমন সব উক্তি করার জন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত। বার্ধক্যহেতু আমি রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করছি।"

হক সাহেব যদিও চাপে পড়েই অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তবুও এই ঘোষণাকে তাঁর মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু এ যুক্তিতে তাঁকে কি স্বগৃহে অন্তরীণ করা যায়? এইসব চাতুরী ও কৌটিল্য যুক্তির পেছনের চক্রান্ত ধ'রে ফেলার জন্য কিছুমাত্র বেগ পেতে হয়নি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের। অশীতিপর হক সাহেবের বার্ধক্যকে (তাঁর বয়েস তখন ৮১ বছর) শাসকচক্র যে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে সে-আশঙ্কা সবারই ছিলো, কাজেই রাজনীতি থেকে তাঁর অবসর গ্রহণে এই প্রদেশের জনগণ অনেকটা স্বস্তিই বোধ করেন। কিন্তু কে জানতো বাংলারই আরেক সন্তান বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর তূনে আরো অনেক বাণ ছিলো? এই সব কয়টি বাণেরই তিনি সদ্ব্যবহার করেছিলেন দক্ষ তীরন্দাজের মতো পরবর্তী কয়েকটি দিনে, আর আঘাতে আঘাতে শতধা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন বাংলার ১৯৫৪ সালের মহান নির্বাচনী মৈত্রী, চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন জনগণের সকল আশা-আকাঙ্খা।

ইতিহাস মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। মাত্র ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মোহাম্মদ আলী সরকার মার্কিন সরকারের সঙ্গে একটি সামরিক চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে এর বিরুদ্ধে তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফলে মার্কিনীদের আশাভঙ্গ হয়, যদিও তাদের পাকিস্তানস্থ রাষ্ট্রদূত মিঃ হিলড্রেথ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের অভূতপূর্ব বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে বিরোধীদলের ঐতিহাসিক বিজয়লাভের পর শাসকচক্রের ত্রাণ কর্তারূপে আবির্ভূত হন মিঃ ক্যালাহান একজন মার্কিন সাংবাদিক। করাচীতে জনাব ফজলুল হকের সংগে এক সাক্ষাৎকারের পর তিনি যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাতে প্রতীয়মান হয় যে, হক সাহেব বাংলার' 'স্বাধীনতা' চান। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক রিপোর্টের প্রতিবাদ ক'রে ঘোষণা করেন: "রিপোর্টের প্রতিটি শব্দ ভিত্তিহীন ও প্রতিটি বাক্য সত্যের অপলাপ মাত্র।" কিন্তু তবু অনেকে যাঁকে 'বাংলার মুকুটহীন নৃপতি' বলে অভিহিত করেন সেই হক সাহেব রেহাই পেলেন না শাসকচক্রের রুদ্ররোষ থেকে, অথচ আমাদের রাজনীতিতে যদি সংসদীয় কানুনের শাসন মেনে নেয়া হতো তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন আদায়কারী হিসেবে সেই সময়েই তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারতেন। কিন্তু তা হবার ছিলো না, কারণ আমাদের তথাকথিত নেতারা অতীতের মতো তখনো কায়েমী স্বার্থ, আমলাতন্ত্র ও সামন্ত প্রভুদের যোগসাজসে দেশের প্রকৃত মালিক জনগণকে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখার নীতিতেই অটল ছিলো।

বিভাগোত্তর পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত সরকারকে যেভাবে বরখাস্ত করা হয় তা' দুনিয়ার কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ইতিহাসে দেখা যায় না। এ-থেকেই কারুপক্ষে অনুমান করা কঠিন ছিলো না,

যে পরবর্তী দিনগুলোতে কি ভয়াবহ নির্মমতার সংগে জনগণের কণ্ঠরোধ করা হবে এবং কায়েমী স্বার্থের বেদীতে তাদের সকল অধিকার ও স্বার্থ বিসর্জন দেয়া হবে। বস্তুতঃ পরবর্তীকালে পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র সংঘটিত হয়েছে তার সব কয়টি ১৯৫৪ সালের ষড়যন্ত্রেরই পুনরাবৃত্তিমাত্র।

কায়েমী স্বার্থের তল্পীবাহক শাসক চক্রের ঘৃণ্য জনবিরোধী ভূমিকা এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানও নির্বিবাদে মেনে নিতে পারেনি। ক্ষমতাসীন দলভুক্ত পশ্চিম পাকিস্তানের বেশ কয়েকজন নেতা তাঁদের দলের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ১৯৫৪ সালের ৯ই এপ্রিল মুসলিম লীগ নেতা জনাব হাশিম গাজদার পাকিস্তান অর্জনের কৃতিত্ব মুসলিম লীগের ব'লে উল্লেখ ক'রে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রণ্ট সেই পাকিস্তানকেই ধ্বংস করতে চায়, কাজেই প্রদেশটির ভাগ্য এই 'দেশদ্রোহীদের' হাতে ছেড়ে রাখা যায় না। তাঁর এই উক্তিতে বিরক্ত হয়ে কয়েকজন স্বদলীয় পূর্ব পাকিস্তানী সদস্য তাঁকে আর বাক্যব্যয় না করে ব'সে পড়তে বাধ্য করেন। লীগের সদস্য ও পয়লা কাতারের মুক্তি সংগ্রামী বেগম শাহনওয়াজ পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রণ্ট সদস্যদের উপর আক্রমণ করার জন্য তাঁর দলের সদস্যদের তীব্র ভর্ৎসনা ক'রে তাঁদের উপদেশ দেন অবিলম্বে যুক্তফ্রণ্ট সদস্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করতে। এ-ব্যাপারে তিনি খান আবদুল গাফফার খানের সাহায্যও প্রার্থনা করেন। ভারতে নিযুক্ত তৎকালীন পাকিস্তানী হাই কমিশনার ও বিশিষ্ট লীগ নেতা রাজা গজনফর আলীও তাঁর দলীয় সদস্যদের তিরস্কার না করে পারেননি। ১৯৫৪'র ১৪ই মে তাঁদের প্রতি প্রদত্ত এক সতর্কবাণীতে রাজাজী যুক্তফ্রণ্টের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়ার দাবী উত্থাপন করেন, কেননা, তিনি মনে করেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনের পরে এই গণপরিষদের আর কিছুমাত্র প্রতিনিধিত্ব

মূলক চরিত্রই অবশিষ্ট নাই।' তিনি দৃঢ়তার সংগে এই মত প্রকাশ করেন যে, পুরাতন গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে 'তার স্থলে একটি নতুন গণপরিষদ নির্বাচন করা হলে' জাতীয় সমস্যার শতকরা ৯০ ভাগই সমাধান হয়ে যাবে।

তিনি ঘোষণা করেন: "দেশের অভ্যন্তরে সত্যি যদি কোন দেশদ্রোহী থেকে থাকে তাহলে সেই দেশদ্রোহীরা হচ্ছে তারা, যারা যে কোন উপায়ে ক্ষমতার গদী আঁকড়ে থাকার জন্য জনগণের মধ্যে প্রাদেশিকতা ও বিরোধের বীজ বপন ক'রে চলেছে।"

কিন্তু স্বদলভুক্ত, শুভার্থী সমালোচকদের সময়োচিত সতর্কবাণীতেও কর্ণপাত না করে শাসকচক্র পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রণ্ট নেতাদের 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বলে চিত্রিত করতে থাকেন। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! কায়েমী স্বার্থের তাঁবেদার ও শাসকচক্রের মিত্রমাত্রই এদেশে দেশপ্রেমিক ব'লে বিবেচিত হন, কিন্তু গণস্বার্থের জন্য যাঁরা আত্মাহুতি দেন তাঁরা হন 'দেশদ্রোহী', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', কিংবা অন্ততঃ 'ভারতের চর', এবং তা-ও আবার শুধু পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রেই!

শাসকচক্রের এইসব অভিযোগের পশ্চাৎপটে, খান আবদুল গাফফার খান ১৯৫৪'র ২৮শে জুন গণপরিষদে যে তথ্য প্রকাশ করেন তা নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। পার্লামেণ্টে ভাষণদান প্রসঙ্গে সীমান্তের এই প্রবীন জননায়ক বলেন: "আমি যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং জনাব সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর বিবৃতিগুলিও দেখেছি। তাঁরা সকলেই দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন পূর্ব পাকিস্তানের (পাকিস্তান থেকে) বিচ্ছিন্নকরণ তাঁরা চান না। অথচ, মুসলিম লীগ সহ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রভাবশালী মহলগুলিতে পর্যন্ত আমি নিজের কানে এ-ধরণের কথাবার্তা শুনেছি যে, এইসব মহল দেশের পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা কামনা করেন।

এবার আমাদের বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে, ১৯৫৪'র মে মাসে মার্কিন সাংবাদিকটিকে প্রদত্ত সেই মহাপ্রলয়কারী সাক্ষাৎকারে জনাব ফজলুল হকের কি বক্তব্য ছিলো এবং তিনি যথার্থ কি বলেছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যমূলক বিকৃত বিবরণের ছুতা ধরেই শাসক-গোষ্ঠী হক সাহেব ও তাঁর দলের ভরাডুবি করেন। ক্যালাহানের রিপোর্টের প্রতিবাদ করে হক সাহেব ঘোষণা করেন :

"গত সোমবার নিউইয়র্ক টাইমসের করাচী প্রতিনিধির সংগে আমার আলোচনা সম্পর্কে উক্ত প্রতিনিধির প্রদত্ত বিবরণ আমার আজ অপরাহ্ন ৪টের দিকে পড়ে দেখার সুযোগ ঘটে। আমি এ-কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি বলে দুঃখিত যে, ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচার ও সত্যের অবিশ্বাস্য রকম বিকৃতি সহকারে যে আকারে আমার ব'লে কথিত বিবৃতিটি প্রকাশ করা হয়েছে তা' উদ্দেশ্যমূলক। বিবৃতিতে উদ্ধৃত প্রতিটি শব্দ ভিত্তিহীন ও প্রতিটি বাক্য সত্যের অপলাপ মাত্র। প্রকাশিত বিবরণের প্রতিটি খণ্ডাংশের প্রতিবাদ করা অসম্ভব। তাই আমি সামগ্রিকভাবে নীচের বিবৃতিটি প্রকাশ করছি। আমি সত্যি সত্যি কি বলেছিলাম এবং আমার সে বক্তব্যকে কতখানি বিকৃত করা হয়েছে, এই বিবৃতি থেকে জনসাধারণ সে সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারবেন বলে আশা করি।

"উক্ত সংবাদদাতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আমি যথার্থ যা বলেছিলাম তা হচ্ছে এই :

"পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানের একটি স্বায়ত্তশাসিত ইউনিট হতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের আদর্শ এবং এর জন্যে আমরা সংগ্রাম করে যাবো। আমি কস্মিনকালেও, মুহূর্তের জন্যও বলি নাই যে "স্বাধীনতাই" হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য।

"এই সাক্ষাৎকারে দুইজন সংবাদদাতা ছিলেন—একজন রয়টারের প্রতিনিধি, অপরজন নিউ ইয়র্ক টাইমসের। তাঁরা পূর্ব

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করেন। জবাবে আমি বলি যে, কোন আগ্রাসনের সম্মুখীন হলে আমরা অবিশ্যি পশ্চিম পাকিস্তানের সাহায্যের প্রত্যাশা করবো। তবে অনুরূপ কোন সাহায্য না পেলে আমরা স্বাবলম্বী হব।

"আমি এ-কথা সত্যি বলেছি যে, একটি প্রথম শ্রেণীর নৌবাহিনী গড়ে তোলার মতো উন্নত জনশক্তি পূর্ব পাকিস্তানের আছে। "এই সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে আলোচনার সূত্রপাত হয়। সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক দুইজনকেও ডেকে আনা হয়। নিউ ইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতা স্বীকার করেন যে, স্বাধীনতার কথা আমি বলিনি। তবে আমার কথাবার্তার ধরণ থেকেই নাকি তিনি এটা অনুমান করে নেন।'

কিন্তু এতেও আর শেষ রক্ষা হলো না। জনাব ফজলুল হক তাঁর বিরুদ্ধে পরিচালিত মিথ্যা প্রচারণার প্রতিবাদ করুন আর নাই করুন, তাতে কিছু যায় আসে না। তাঁর পতন ছিলো অনিবার্য। কারণ পাকিস্তানের শাসকচক্রের কাছে পূর্ব বাংলার সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা ও তাঁদের নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর চাইতে মার্কিন সাংবাদিক ক্যালাহানের মর্যাদা ছিলো অনেক বেশী।

স্মরণীয় যে, মাত্র তার আগের দিনই জনাব ফজলুল হক এবং জনাব আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবর রহমান ও জনাব সৈয়দ আজিজুল হকসহ তাঁর মন্ত্রিসভার আরো পাঁচজন সদস্য এক যুক্ত বিবৃতিতে দৃঢ়তার সাথে ও দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, 'পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অভিসন্ধি পূর্ব পাকিস্তানের নাই ; তাঁরা (যুক্তফ্রণ্ট নেতৃবর্গ) বিশ্বাস করেন যে, 'পাকিস্তান এক ও অবিভাজ্য' এবং 'আমাদের ঐক্যের উপরই নির্ভর করে প্রিয় মাতৃভূমির নিরাপত্তা'।

পশ্চিম পাকিস্তানী পত্রিকাগুলিতে পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে প্রচার অভিযান শুরু করা হয় তার প্রেক্ষিতেই হক সাহেব ও তাঁর সহকর্মীরা এই বিবৃতি প্রচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, যদিও

জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের সততার প্রমাণ দেয়ার জন্যে এ ধরণের একটা বিবৃতি দেয়ার কোন প্রয়োজন তাঁদের ছিলো না। নিয়তির কি পরিহাস, জাতির বৃহত্তর অংশের নির্বাচিত প্রতিনিধি তাঁদের আচরণের কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হন তাদের কাছে যাদের পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছিলো অনেক আগেই। কিন্তু আখেরে তাতেও কাজ হলো না কিছুই, কেননা শাসকচক্র স্থিরপ্রতিজ্ঞভাবেই তাদের মনের দরোজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছিলো পূর্ব পাকিস্তান ও তার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে। তাই নিয়তির অমোঘ নির্দেশের মতো হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটে পরের দিনই। ওরা একেই বলে গণতন্ত্র! আবার গণতন্ত্রকে গলা টিপে মারার অভিযোগে আসামীর কাঠগড়ায় ওরা দাঁড় করাতে চায় এই ভাগ্যহত বাংলাদেশের জনগণকেই।

আমাদের স্বল্পপরিসর জাতীয় জীবনের বেদনাময় ইতিহাসের এইটেই হচ্ছে সবচাইতে শোকাবহ দিক। তবুও দেখতে পাই দেশের উভয় অংশেই আজো রয়েছেন এমন অনেক বন্ধু সুজন যাঁরা অহরহ গণতন্ত্রের স্তোত্রপাঠ শোনাতে চান এই প্রদেশের জনগণকে, তাঁদের শেখাতে চান গণতন্ত্রের রীতি পদ্ধতি।

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব এ, কে, ফজলুল হক ও তাঁর সহকর্মীরা করাচীতে অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবী উত্থাপন করেছিলেন ১৯৫৪'র ২৮শে মে। পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষ থেকে তাঁদের উপরোক্ত দ্ব্যর্থহীন ঘোষণাটি প্রচারিত হয়েছিলো তারই পরের দিন। তার পরের দিন ৩০শে মে তাঁরা ফিরে আসেন ঢাকায়। বিমান বন্দরে অগণিত জনতার সমুদ্র উদ্বেল হয়ে উঠেছিলো তাঁদের সম্বর্ধনার জন্য। জনতার বিরাট মিছিল বিজয়গর্বে উদ্দাম আনন্দে তাঁদের নিয়ে আসে শহরে। কিন্তু পর মুহূর্তেই বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো সবাই বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে জানতে পেলেন যে, প্রদেশের প্রথম ও একমাত্র জনপ্রিয় সরকারকে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং ৯২-ক

ধারা জারী করা হয়েছে। এই সেদিনও যিনি ছিলেন প্রতিরক্ষা দফতরের অখ্যাত সেক্রেটারী মাত্র, তিনিই হাতিয়ে নিলেন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বময় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার রজ্জু। এইভাবে সাড়ে পাঁচ কোটি লোকের ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত প্রথম জনপ্রিয় সরকারের পতন ঘটে মাত্র ৫৭ দিনে। গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক রীতি পদ্ধতিকে কিভাবে কার্যে প্রযুক্ত হতে দেয়া হয়েছিলো এটি ছিলো তারই একটা নমুনা। পরেও এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বহুবার। কিন্তু এ সব কিছুর পরেও, গণতন্ত্রের বুলিকেই যাঁরা সার করেছেন তার অন্তর্বস্তু বাদ দিয়ে তাঁরাই গণতন্ত্রের নসিহত বর্ষণ করে চলেছেন পূর্ব পাকিস্তানের সেই জনবরেণ্য নেতাদের উপর, জনগণের উপর যাঁদের বিশ্বাস নীলাম্বু বারিধির মতোই গভীর এবং সেই জনগণের কল্যাণ-ভবিষ্যতের জন্যই যাঁরা উৎসর্গিত-প্রাণ।

যে-পরিস্থিতির পটভূমিতে পূর্ব পাকিস্তানী নেতারা উপযুক্ত বিবৃতি-প্রচার করতে বাধ্য হয়েছিলেন সেই পরিস্থিতিটি বিবেচনা করা যাক। ১৯৫৪'র প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্রই শান্তি-পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা শাসনভার গ্রহণের সাথে সাথেই পরিস্থিতির মারাত্মক ও বিস্ময়কর মোড় পরিবর্তন ঘটে। মাত্র একমাসের মধ্যেই চন্দ্রঘোনায় ও আদমজী জুট মিলে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা সংঘটিত হয় এবং তাতে ৪ শতাধিক শ্রমিক নিহত হন। এই শোকাবহ ঘটনাগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার ফেনিয়ে ফাপিয়ে তুলে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তাঁদের ষড়যন্ত্রে কাজে লাগাতে চেষ্টিত হন। হক মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বোগরাকে স্বয়ং প্রদেশ সফরে এসে সরেজমিনে তদন্ত করার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর আকস্মিক 'অসুস্থতার' অজুহাত দিয়ে তাঁদের এই আমন্ত্রণের পাশ কাটিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য ডঃ এ, মালিক ও সরদার আমীর আজমকে নিয়ে গঠিত একটি যুক্ত মিশনকে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী তদন্ত করে দেখার জন্য পাঠান। কিন্তু ডঃ মালিকের সঙ্গে যাবার জন্যে

সরদার আমীর আজমকে খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে তদন্তের কাজ যুক্তভাবে চালানো সম্ভব হয় নি। পরে দেখা যায় যে, সরদার আমীর আজম প্রাদেশিক সরকারের অজান্তিকে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে তদন্তের কাজ সমাপ্ত ক'রে করাচীতে ফিরে গেছেন। এদিকে ডঃ মালিক আদমজী মিলের ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্তের পর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে রিপোর্ট পেশ করেন তার সাথে সরদার সাহেবের রিপোর্টের বিস্তর অমিল দেখা যায়। তদন্তের নামে এই প্রহসনের ফলে সন্দেহের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এই সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয় যখন কেন্দ্রীয় সরকার হক মন্ত্রিসভা কর্তৃক হাইকোর্টের জনৈক বিচারপতির নেতৃত্বাধীনে নিযুক্ত তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটিকে কাজ করার অনুমতি না দিয়ে তার স্থলে দলের লোকদের নিয়ে (যে দল নির্বাচনে পর্যুদস্ত হয়েছিলো) তিন সদস্যের একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এইসব ঘটনা দৃষ্টে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিশ্বাস স্থাপনের আর কোন সঙ্গত কারণ অবশিষ্ট থাকে নাই।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের পত্রিকাগুলিতে যে গভীর অশুভ ইঙ্গিতবাহী প্রচারণার অভিযান শুরু করা হয় তার প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের জনমনের উদ্বেগাকুল সন্দেহের কারণ অনুধাবন করা কঠিন ছিলো না। সাংবাদিক সততা ও নিষ্ঠার আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়ে ডন, জং, আনজাম ও টাইমস অব করাচীর মতো পত্রিকাগুলো দিনের পর দিন যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার পদচ্যুতি ও ৯২-ক ধারা জারীর দাবী উত্থাপন করতে থাকে। সবার উপরে টেক্কা মারে করাচীর কয়েকটি দৈনিক। তারা বড় বড় হরফে কাঠের টাইপের ব্যানারে হক সাহেবের গ্রেফতারের খবর দিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। অথচ হক সাহেব তখন দিব্যি করাচীময় চষে বেড়াচ্ছিলেন বড়লাট বাহাদুর গোলাম মোহাম্মদ ও অমাত্যশিরোমণি মোহাম্মদ আলী বোগরার সংগে সাক্ষাৎকার ও বৈঠক ব্যাপদেশে। এমনকি

তাঁর মন্ত্রিসভার বৈঠকেও তিনি পৌরোহিত্য করে যাচ্ছিলেন যথারীতি। কিন্তু দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার নামে কি চরম ও জঘন্য ভণ্ডামীরই না আশ্রয় নিয়েছিলো এই পত্রিকাগুলো।

আমাদের জাতীয় জীবনের গত ২৩ বছরের ইতিহাস গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, সকল প্রশ্নের উপরই বরাবর সমস্বরে রায় দিয়ে আসছে কেন্দ্রের শাসকচক্র, কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠী, রাজনীতিকের নামাবলীর অন্তরালবর্তী সামন্ত প্রভুরা ও পশ্চিম পাকিস্তানী পত্র পত্রিকা। আর এই রায়ের ভিত্তিতেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের সরকার ও জনগণের ভাগ্য। অথচ আমাদের ইতিহাসের কোন পর্যায়েই পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা কিংবা তাদের মুখপত্রগুলি পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার বা সেখানের সমস্যার উপর নিজেদের রায় জারী ক'রে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাবার প্রয়োজন বোধ করেননি। এভাবেই অপর অঞ্চলের মুষ্টিমেয় কিছু লোকের কৃপা ও ইচ্ছার মুখাপেক্ষী রেখে জাতির বৃহত্তর অংশ-অধ্যুষিত এই অঞ্চলকে বরাবর ব্যবহার করে আসা হয়েছে তাদের হাতের পুতুলের মতো। এই ব্যবহার কি দেশে গণতন্ত্রের আদর্শকে সমুন্নত রাখার প্রাণান্ত প্রয়াসের নিদর্শন, না ঐক্য ও সংহতির নামে পূর্ব পাকিস্তানকে চিরকালের জন্য শোষণ ও প্রতিক্রিয়ার শক্তির কাছে পদানত রাখার অপ্রচ্ছন্ন দুরভিসন্ধিরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ? এই দুরভিসন্ধির জঠরেই নিহিত রয়েছে দেশের অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতার সমূহ বিপদের বীজ।

কিন্তু তবু প্রদেশের নির্বাচিত আইন পরিষদের পূর্ণ আস্থাভোগী সরকারের বিরুদ্ধে গৃহীত তাঁর অগণতান্ত্রিক কার্যক্রমের সাফাই দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বোগরা সরকারী বেতারযন্ত্রে ঘোষণা করেন যে, 'আমার দেশবাসী জনাব ফজলুল হককে যে দেশদ্রোহী কুলাঙ্গার বলেই' ঘৃণা করবে সে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অতলান্ত পার থেকে রাতের আঁধারে চুপি সারে উড়ে এসে জুড়ে বসা

স্বয়ম্ভু এক প্রধানমন্ত্রী জনগণের নির্বাচনের বরণডালায় বৃত এক মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন 'তুই ব্যাটা দেশের দুষমন বটে' এর চাইতে ন্যাক্কারজনক আর কি হতে পারে ?

তবে পাকিস্তানের রাজনীতিতে এ হেন ঘটনা মোটেই দুর্ঘট নয়। আমাদের নাতিদীর্ঘ ইতিহাসের পরিসরে এর আরও বহু দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। দেশের এই অঞ্চলের জনস্বার্থ রক্ষায় যিনিই এগিয়ে আসেন তাঁর মস্তকেই পরিয়ে দেয়া হয় এই 'দেশদ্রোহী'র শিরোপা। পূর্ব পাকিস্তানের জননেতারা ও তাঁদের সমর্থকেরা যেন মায়ের গর্ভ থেকেই এই পৃথিবীতে এসেছেন এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে। 'দেশদ্রোহীর' তমঘাই যেন তাঁদের একমাত্র অঙ্গের ভূষণ। দেশপ্রেম যদি পাপ হয়, তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এই প্রায়শ্চিত্তের 'যোগ্য' বৈ কি। কিন্তু কোন খাঁটি মুসলমানই এ কথা ভুলতে পারে না যে 'দেশপ্রেম ঈমানেরই অঙ্গ'; আর এই ঈমান থেকে কোন দিনই বিচ্যুত হবে না পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ। ..

যে-সব ওজস্বী নায়ক-পুঙ্গব তাঁদের পূর্ব পাকিস্তানী রাজনৈতিক শত্রুদের উদ্দেশ্যে অহরহ 'গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রের রীতিনীতি' সম্পর্কে নসিহত বর্ষণ করেন, তাঁদের প্রতি আমাদের বিনীত জিজ্ঞাস্য : তাঁদের মতে, পাকিস্তানে গণতন্ত্রের বিকাশ রুদ্ধ হবার জন্যে দায়ী কারা ? তাঁদের নসিহতের সয়লাবে প্লাবিত পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় নেতারা, না পাকিস্তানে গণতন্ত্রকে বিকশিত হতে না দেবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেশের অপর প্রান্তের নেতারা ? তাঁরা বুকে হাত রেখে বলতে পারেন কি, গণতন্ত্রের কোন্ আইনে বা 'গণতান্ত্রিক রীতিনীতির' কোন সূত্র অনুসারে জনসমর্থনলেশ শূন্য শাসকচক্র তাঁদের জীবৎকালের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় একটি সরকারকে বরখাস্ত করেছিলেন ? ১৯৫৪'র ঘটনাবলীর চাইতে গণতন্ত্র হনন ও ধর্ষনের 'উজ্জ্বলতর' নজীর তাঁরা দেখাতে পারবেন কি ? এবং এর পরে আর বিশ্বাস করার কোন সঙ্গত কারণ

অবশিষ্ট থাকে কি যে, পাকিস্তানের রাজনীতিতে কোনদিন সত্য ও ন্যায়ের অনুশাসন কায়েম হতে পারবে? গণতান্ত্রিক বিশ্বের কাছে তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে, কোন যুক্তিবলে তাঁরা জনসাধারণ কর্তৃক ৫ বছরের জন্য বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত একটি জনপ্রিয় সরকারকে মাত্র ৫৭ দিনের মধ্যেই খতম করলেন। তাঁদের আরো জবাবদিহি করতে হবে, যে জনগণ মাত্র কয়েক দিন আগে তাঁদের শাসন কার্য পরিচালনার জন্য নিজস্ব প্রতিনিধিদের নির্বাচন করেছিলেন, কি হেতু তাঁদের উপর ত্রাসের রাজত্বের বিভীষিকা সৃষ্টির জন্য প্রতিরক্ষা দফতরের সেক্রেটারী জেনারেল ইস্কান্দর মীর্জাকে গভর্ণররূপে চাপিয়ে দেয়া হয়। আমাদের চক্রান্ত বিশারদ বন্ধুবরেরা দেশের রাজনীতিতে গণমানসের সুষ্ঠু প্রতিফলন রোধ করার জন্যে শুরু থেকেই যে নীতি অনুসরণ করে আসছিলেন এটা ছিলো তারই একটি অভিব্যক্তিমাত্র। তাঁদের এই নীতির লক্ষ্যই ছিলো দেশের উপর তাঁদের 'প্রতিভূ শাসন ও শ্রেণী শোষণ' ব্যবস্থা নিরঙ্কুশভাবে কায়েম রাখা।

আমার বিশ্বাস, এখানে পাঠকদের বিবেচনার জন্য জনাব ফজলুল হক ও তাঁর সহকর্মীদের ২৯শে মে, ১৯৫৪ তারিখের যুক্ত বিবৃতির, পূর্ণ বিবরণ উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পূর্ব পাকিস্তানের তৎসাময়িক অবিসংবাদিত নেতাদের এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণাও কেন্দ্রের শাসকচক্রকে তাদের কুটিল চক্রান্তের জটাজাল বিস্তার থেকে নিরস্ত করতে পারেনি। বস্তুতঃ পরের দিনই তারা যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেছিলো।

জনাব এ, কে, ফজলুল হক ও তাঁর সহকর্মীরা যুক্তবিবৃতিতে বলেন:

"আমরা দৃঢ়তার সংগে ঘোষণা করছি যে, পাকিস্তানের দুইটি অংশ অবিচ্ছেদ্য এবং পাকিস্তান এক ও অবিভাজ্য। কোন অবস্থাতেই দুইটি অংশ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। আমরা সাচ্চা পাকিস্তানী। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের প্রিয় দেশ পাকিস্তানের ঐক্য

ও সংহতি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। আমাদের ঐক্যের উপরই নির্ভর করে দেশের নিরাপত্তা।

"আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চাই কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা কস্মিনকালেও আমাদের কাম্য নয়। আমরা আমাদের ত্যাগকে বিফলে যেতে দেব না। দেশের দুই অংশের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য যে সব অশুভ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করার জন্যে আমরা জীবনপণ সংগ্রাম করে যাবো।

"পাকিস্তানের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান ও দুই অংশের মধ্যে সহস্রাধিক মাইলের ব্যবধানের ফলে এই দেশের পক্ষে একটি এককেন্দ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সমীচীন হবে না। এই বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান ও সহস্রাধিক মাইলের ব্যবধান না থাকলে আমরা নিঃসন্দেহে এককেন্দ্রিক ধরণের সরকার প্রতিষ্ঠার অনুকূলেই মতপোষণ করতাম।

"আমরা শুধু এ কারণেই প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রা-ব্যবস্থা—এই ৩টি বিষয় কেন্দ্রের এখতিয়ারে রেখে অবশিষ্ট সকল বিষয়ে প্রদেশের অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা চাই। আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিও ছিলো এই, এবং এই প্রতিশ্রুতি থেকে আমরা ইঙ্গিমাত্রও বিচ্যুত হইনি। আমাদের ইস্তাহার কিংবা বক্তৃতা-বিবৃতিতে কোথাও আমরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নকরণ দাবী করি নাই।"

সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের নির্বাচিত নেতাদের এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণাতেও তাঁদের দেশাত্মবোধ প্রমাণিত হতে পারলো না এমন একটি দেশে যার সৃজনকর্মে তাঁদের অবদান ছিলো আর সবার চাইতে অনেক বেশী। আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানী বন্ধুদের অনুরোধ করবো, তাঁরা কল্পনায় নিজেদেরকে আমাদের অবস্থায় ফেলে অনুভব করার চেষ্টা করুন আমাদের বঞ্চিত মনের বেদনার্ত হাহাকার।

১৯৫৪ সালের বেদনাময় ঘটনা প্রবাহের অন্তর্নিহিত কারণ ছিলো এই যে, ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবার পরেও পূর্ব পাকিস্তানকে পদানত রাখার সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হতে রাজী হয়নি। তাই জনাব হক সাহেব যখন সাড়ে পাঁচ কোটি বাঙ্গালীর অকুণ্ঠ সমর্থনে আশীষধন্য নেতা হিসেবে জনস্বার্থের জন্য সংগ্রাম করছিলেন তখন তাঁকে তারা চিত্রিত ক'রে গণদুশমন 'দেশদ্রোহী' হিসেবে, কিন্তু এই অশীতিপর বৃদ্ধ যখন নিজের গা' বাঁচাতে গিয়ে শাসকগোষ্ঠীর চাপের নিকট নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন তখন তাঁকেই আবার তারা অভিনন্দিত করে দেশপ্রেমিক কুলের চূড়ামণি বলে।

নিছক ব্যক্তিগত কারণেই জনাব ফজলুল হক মাত্র কিছুদিন আগে যে দলটি পূর্ব পাকিস্তানের মাটি থেকে নিঃশেষে মুছে গিয়েছিলো সেই দলটির সংগেই হাত মেলান। তাঁর ও তাঁর নিকট সহচরদের এই ভূমিকার ফলেই যুক্তফ্রণ্টে মারাত্মক ফাটল দেখা দেয়। ১৯৫৪-র গৌরবময় নির্বাচনী মৈত্রী শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং জনগণের ভাগ্যের সূত্র আবার গিয়ে পড়ে সেই পুরাতন ও পরিচিত 'হালুয়া-রুটি' সন্ধানীদের হাতে। 'বিভাগ ও শাসন' নীতির ষড়যন্ত্র এভাবেই সফল হলো এবং তখন থেকে আমাদের রাজনীতির অনুপনেয় চারিত্র্য হয়ে দাঁড়ালো।

একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, সংবিধান রচনার জন্য পাকিস্তান প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলো ১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চ, গণপরিষদে 'আদর্শ প্রস্তাব' (অবজেকটিবস রেজল্যুশন) গ্রহণের মাধ্যমে সেদিনই পরিষদ একটি মূলনীতি কমিটি (বেসিক প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ কমিটি,—বিপিসি) নিয়োগ করেন। বিপিসি আবার নিয়োগ করেন তাঁদের কাজের পরিধি, প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে রিপোর্ট পেশের জন্য একটি ষ্টিয়ারিং কমিটি। ষ্টিয়ারিং কমিটি রিপোর্টের প্রস্তাব অনুসারে, বিপিসি-র কাছে সুপারিশ পেশ করার জন্য তিনটি সাব-কমিটি নিয়োগ করা হয়। সাব-কমিটিগুলি হচ্ছে :

(১) ফেডারেল ও প্রাদেশিক সংবিধান ও ক্ষমতাবণ্টন সাব-কমিটি ;
(২) ভোটাধিকার সাব-কমিটি ; ও
(৩) বিচার বিভাগ সংক্রান্ত সাব-কমিটি।

মূলনীতি কমিটি (বিপিসি) ১৯৫০-এর ৭ই সেপ্টেম্বর গণপরিষদে অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করেন। কিন্তু এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তুমুল বিক্ষোভ দেখা দেয়।

কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা কনফেডারেশনের স্বপক্ষে জোর দাবী উত্থাপন করেন। এমনকি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চৌধুরী নাজির আহমদও এই দাবীর সমর্থনে জোরালো ভাষায় যুক্তিপ্রদর্শন করেন, যদিও তিনি ছিলেন আদর্শ প্রস্তাব সমর্থকদেরই অন্যতম।

বিপিসি রিপোর্টের উপর সবচাইতে সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করেন পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যতম গণপরিষদ সদস্য মিয়া ইফতিখারুদ্দীনের মালিকাধীন পাকিস্তান টাইমস। এই পত্রিকার মতে, বিপিসি রিপোর্ট ছিলো ফেডারেল ও এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার মাঝামাঝি একটা আধা-খ্যাঁচড়া ব্যবস্থা, কিন্তু এহেন অভিনব আবিষ্কার ফেডারেল গণতন্ত্রের আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। পত্রিকাটি মন্তব্য করেন যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী মুখপাত্রদের মধ্যে যে অশোভন বাকবিতণ্ডার সূত্রপাত হয়েছে তার সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান হচ্ছে সংবিধানের একটি কনফেডারেল প্রকল্প গ্রহণ; এ রকম একটি প্রকল্প লাহোর প্রস্তাবের সংগেও সংগতিপূর্ণ হবে।

পাকিস্তান টাইমস আরো বলেন : "তার চাইতেও বড় কথা, "অনড় ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এবং পাকিস্তানের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীর বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে এরকম একটি সংবিধান অপরিহার্য।" মিয়া ইফতিখারুদ্দীনের যুগের পাকিস্তান টাইমস মনে করতেন : "পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান, দুই অঞ্চলের জনগণের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভংগীর পার্থক্য ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর বৈচিত্রের ফলে পাকিস্তানে একটি কেন্দ্রীভূত প্রশাসন কাঠামোর ধারণা অচল হয়ে পড়ে।"

উভয় অঞ্চলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ঐক্য ও সৌহার্দ্যের যোগসূত্র সৃষ্টিই "সকল পাকিস্তানীর সাধারণ লক্ষ্য" ব'লে উল্লেখ ক'রে পাকিস্তান টাইমস বলেন: "এ রকম ঐক্যের সেতু গ'ড়ে তোলার উপায় হচ্ছে—যে সব ক্ষেত্রে ঐক্য অপরিহার্য, যেমন প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক, সে সব ক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাওয়া, বরং যে সব ক্ষেত্রে এই রকম ঐক্য শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয় বরং উভয় অঞ্চলের স্বার্থের সংগতি বিধানের ক্ষেত্রে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে ও নিছক প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকেও অসুবিধাজনক বিবেচিত হয় সে সব ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের পৃথকীকরণের ব্যবস্থা করা।"

পশ্চিম পাকিস্তানে কনফেডারেশন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কে পত্রিকাটি সুপারিশ করেন: "কনফেডারেশনের এই অংশের (অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের) আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা জনগণের, বিশেষতঃ ক্ষুদ্রতর প্রদেশগুলোর জনগণের, ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে।" এতদুদ্দেশ্যে মিয়া ইফতিখারুদ্দীনের পত্রিকা যে ফর্মুলার প্রস্তাব করেন তা হচ্ছে "পশ্চিম পাকিস্তানে একটি ফেডারেশন গঠন। এই ফেডারেশনে সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি ফেডারেল সরকারের শাসনাধীন থাকবে। ফেডারেল সরকার নিয়ন্ত্রিত হবেন একটি দুই কক্ষবিশিষ্ট বিধানসভা দ্বারা এবং এই বিধানসভার শক্তিশালী উচ্চ পরিষদে সকল ইউনিটের সমান প্রতিনিধিত্বের অধিকার থাকবে।"

অপরিমেয় খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অধিকারী একজন পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিকের এই ছিলো সুচিন্তিত অভিমত। এবং এই কথা বিনাদ্বিধায় বলা যায় যে, সেই সময়ে তাঁর পত্রিকাই পশ্চিম পাকিস্তানে জনমতের বৃহত্তর অংশের প্রতিধ্বনি করতো। পাকিস্তানী রাজনীতির দীর্ঘ ১৮ বছরের তিক্ততম অভিজ্ঞতার পর দেশ আজ এসে উপনীত হয়েছে বর্তমানের এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে, এবং পূর্ব পাকিস্তান যে তিমিরে ছিলো আজো রয়ে গেছে সেই তিমিরেই। সুতরাং পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসন দাবীতে অভাবিতপূর্ব কিছুই নাই।

এত সব সত্ত্বেও, আমাদের রাজনীতির প্রাচীন পালোয়ানদের অনেকেই বিতর্কমূলক শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নগুলো নির্বাচনের ইস্যু হিসেবে উত্থাপনের বিরোধিতা করেন, কেননা 'তাতে করে রাজনৈতিকদলগুলোর মধ্যে তিক্ততা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হতে পারে।' কেউ কেউ আবার এতদূর পর্যন্ত গিয়েছেন যে তাঁদের অভিমত, স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে প্রেসিডেণ্টেরই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা উচিত, যেমন তিনি করেছেন এক ইউনিট ও জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে। এক ইউনিট বাতিলকরণ ও জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ববিধি প্রবর্তন সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট সবিস্তারে যুক্তিপ্রদর্শন করেছেন। বাকী রয়েছে শুধু স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন। আর এই প্রশ্নটিই হচ্ছে অতীত ও বর্তমানের সকল বিরোধ ও বিসম্বাদের মূল কারণ। স্বাধীনতা লাভ করেই এবং তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এই প্রশ্নে জনগণের সুস্পষ্ট ম্যাণ্ডেটের পদদলন ও আমাদের নেতাদের বারংবার প্রদত্ত স্পষ্টতর প্রতিশ্রুতিগুলির বিস্মরণই এই বিসম্বাদের আদিকথা। প্রশ্নটি এখন এমন জটিল রূপ পরিগ্রহ করেছে যে এর সমাধান আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। এই নেতাদের স্বরূপও আমাদের জনগণের কাছে আর অজানা নাই। তাই দলীয় নেতাদের পর্যায়ে সমস্যাটির সমাধানের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ ব্যাপক অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে।

অতীতের এই তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে, প্রশ্নটির চূড়ান্ত মীমাংসার একমাত্র উপায় হচ্ছে এটিকে জনগণের কাছে, তের কোটি দেশবাসীর কাছে, সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করা। জনগণের নির্বাচনী আদালতের কাছে প্রশ্নটিকে সোপর্দ করা হলে আর রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টির কোন অবকাশ থাকবে না, বরং গত দুই যুগ ধরে রাজনৈতিক নেতারা অবলীলাক্রমে জনগণকে পাশ কাটিয়ে যাবার ফলে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে এতে সেই রকম তিক্ততা সৃষ্টির সম্ভাবনা কমই হবে। এই রকম একটি অতি জটিল ও বিতর্কমূলক

শাসনতান্ত্রিক সমস্যা জনগণের আড়ালে থেকে সমাধান করার জন্য পুনর্বার দাবী উত্থাপন করার চাইতে লজ্জাজনক ও বিস্ময়কর আর কিছু হতে পারে না। আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বারংবার এভাবে জনগণকে পাশ কাটিয়ে যাবার ঘৃণ্য নীতি অবলম্বনের ফলে সমস্যার কোন সুষ্ঠু সমাধান নির্ণয়ের পরিবর্তে একের পর এক নতুনতর সমস্যারই সৃষ্টি করা হয়েছে শুধু, কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কাজেই সেই পুরাতন ও ধিকৃত নীতির পুনরাবৃত্তি আর বরদাশত করা চলে না। অতীতের এই অভিজ্ঞতার তুলাদণ্ডে বিচার করা হলে দেখা যাবে, প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া যথার্থই বলেছেন এই প্রশ্নের মীমাংসা করবেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। জাতির নানামুখী সমস্যা সম্পর্কে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ যে অভিমত প্রকাশ করবেন সেই অভিমতের আলোকে সুষ্ঠু সমাধান নির্ণয়ের জন্য জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই হবেন যথার্থভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অতীতে জনমতকে উপেক্ষা করার ও জনগণের ম্যাণ্ডেটকে পাশ কাটিয়ে যাবার জন্য ও বর্তমানের এই শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সৃষ্টির জন্য যে সব নেতা দায়ী, তাঁরাই এখন আবার বিস্তর হাঁক ডাক শুরু করেছেন এই বিতর্কমূলক শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান নেতৃপর্যায়ে নির্ণয়ের জিগীর তুলে।

যাঁরা প্রেসিডেণ্টের কাছে সুপারিশ করছেন এই সমস্যার উপর তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত জারী করার জন্য, তাঁরাই কিন্তু এতদিন গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে আসছিলেন এই বলে যে, 'জনগণের হয়ে তাঁদের শাসনতান্ত্রিক সমস্যাদির উপর যাহোক একটা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার এখতিয়ার কোন একক ব্যক্তিরই নাই, তা তিনি যতই শক্তিশালী কিংবা সামরিক আইন সজ্জিত হোন না কেন।'

এ থেকেই পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, আমাদের নেতারা জনস্বার্থের বিরুদ্ধে তাঁদের অতীতের সেই পুরনো খেলাটাই আবার নতুন

করে জমিয়ে তোলার প্রাণপণ চেষ্টায় আছেন। কিন্তু গত ২৩ বছরের অভিজ্ঞতার খতিয়ান নেয়ার পর যদি কেউ সত্যি সত্যি এবং আন্তরিকভাবে দেশ ও জাতির সেবায় অগ্রসর হতে চান তা'হলে তাঁকে অবিশ্যি লাহোর প্রস্তাবের পটে চিত্রিত পাকিস্তানের প্রকৃত স্বরূপ, জনগণের কাছে জাতির পিতার পৌনঃপুনিক প্রতিশ্রুতি ও বিভাগোত্তর কালের ঘটনা প্রবাহ গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে অনুধাবন করতে হবে, তা না হলে কোনরকম হুমকী ধমকি কটাক্ষ কষাঘাত কিংবা ধর্মের নামে প্রদত্ত ফতোয়াতেও আর কিছু কাজ হবে না। ভুলে গেলে চলবে না যে, জনগণই হচ্ছে দেশের প্রকৃত মালিক, সুদূর অতীতে একদা যাঁরা পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন সেই তথাকথিত নেতারা নয়। কাজেই জাতীয় জীবনের এই ক্রান্তিলগ্নে সকল শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে যাঁদের রায় নিতে হবে তাঁরা হচ্ছেন জনগণ। অন্য কেউ নন। গণতন্ত্রে ও গণতান্ত্রিক রীতি নীতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রই জনগণের নির্দেশ মাথা পেতে মেনে নিতে বাধ্য। তা সেই নির্দেশ তাঁর মনঃপূত হোক আর নাই হোক। আমাদের নেতারা যদি বিলম্বে হলেও এ সত্যটি অনুধাবনে ব্যর্থ হন, তাহলে একমাত্র খোদাই জানেন জাতির ভাগ্যে কি আছে। আজ আমাদের প্রত্যেককেই নিজের বিবেকের খতিয়ান নিয়ে সামনে চলার জন্য সুষ্ঠু পথ চিনে নিতে হবে, বেছে নিতে হবে। গণতন্ত্রের কাছে—শুধু গণতন্ত্রের কাছেই আমরা আলোর সন্ধান পেতে পারি। জনগণের ইচ্ছা ও অধিকার দলনের যে কোন প্রয়াস জাতির অগ্রগতি ব্যাহত করবে।

জনস্বার্থকে যেন আমরা প্রতারণার খড়গে আবার হনন না করি। সেনাবাহিনীর একজন জেনারেলের পক্ষেও নিম্নোক্ত যে নীতিতে আস্থা স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে, আমরা যেন বিশ্বের কাছে সপ্রমাণ করতে উদ্যত না হই যে আমাদের রাজনীতিকেরা তাতে একমত হতে অপারগ হয়েছেন: জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপরই বিতর্কমূলক সমস্যাবলী সমাধানের দায়িত্ব অর্পন করা হবে।

পাকিস্তানের জনগণকে অতীত অভিজ্ঞতার পাঠশালা থেকে বহু শিক্ষার সারসঙ্কলন ক'রে তাঁদের নেতাদের শেখাতে হবে, জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার আশা যদি তাঁরা রাখেন তাহলে তাঁদের আচরণ কোন নীতিশৈলীর অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। এই শিক্ষার আলোকেও যদি তাঁদের চরিত্রের পুনর্গঠন সম্ভব না হয় তাহলে সেই নেতাদের অবিশ্যি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াতে হবে, কেননা তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও মুনাফা শিকারের বেদীতে 'বলির পাঁঠার' মত জনগণকে ব্যবহার করার অধিকার কেউ তাঁদের দেয়নি।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট—ক

[১৯৪৭ সালের ২৭শে এপ্রিল দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত মিঃ এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দীর বিবৃতি। এই বিবৃতিতে তিনি "অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার" স্বপক্ষে যুক্তিপ্রদর্শন করেন।]

বাংলার সমৃদ্ধি ও কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রই এটা লক্ষ্য করে মর্মাহত হবেন যে, বাংলাকে দ্বিধাবিভক্ত করার জন্য কোন কোন মহল থেকে একটা প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত করা হয়েছে। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে কিছু সংখ্যক হিন্দুর চরম হতাশা ও তজ্জনিত ধৈর্যচ্যুতি, কারণ প্রদেশে তাদের সম্প্রদায়ের জনবল, তাদের সম্পদ, প্রভাব, শিক্ষা-দীক্ষা, প্রচারণা ও প্রশাসনযন্ত্রে তাদের প্রাধান্য এবং তাদের অন্তর্নিহিত শক্তিসত্বেও বঙ্গীয় মন্ত্রিসভায় তাঁরা যথোপযুক্ত অংশ থেকে বঞ্চিত রয়েছেন।

এই নৈরাশ্যের প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশ যে ধরনের একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে বলে আমি আশা করছি সে ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যে বর্তমান অবস্থা অব্যাহত থাকতে পারে না সেটা তাঁরা বুঝতে পারছেন না। আমরা আজ ভারতে এমন একটি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চলেছি যে সংগ্রামে অখিল ভারত পরিধিতে কয়েকটি বিরোধীয় শক্তি একের উপর অন্যের ইচ্ছাকে চাপিয়ে দেয়ার মরণপণ চেষ্টায় লিপ্ত, কিন্তু প্রত্যেক পক্ষই নতি স্বীকারের জন্য এমন মূল্য দাবী করছে যা প্রতিপক্ষ দিতে প্রস্তুত নয়।

রাজনীতির উপর এর প্রভাব

তাদের বিরোধসমূহে সকল প্রদেশের রাজনীতিই গভীরভাবে প্রভাবিত এবং সেই ক্ষেত্রে প্রদেশগুলির সমস্যাবলীও সমষ্টিগতভাবেই বিবেচ্য। কিন্তু যখন প্রত্যেকটি প্রদেশকেই এককভাবেই নিজের

সমস্যাবলীর মোকাবেলা করতে হবে, এবং প্রত্যেকটি প্রদেশই পূর্ণতঃ না হলেও কার্যতঃ স্বাধীন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে তখন অবশ্যই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে, এবং বাংলার জনগণকে পরস্পরের উপর নির্ভর করতে হবে।

এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য যে এই রকম একটা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলায় এমন একটি মন্ত্রিসভা টিকে থাকতে পারবে যা বাংলার সকল প্রধান সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে গঠিত হবে না কিংবা যা হবে একটি মাত্র সাম্প্রদায়িক দলের সমন্বয়ে গঠিত কিংবা যাতে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব বর্তমান অপেক্ষা উন্নততর হবে না। আমার মনে হয় না যে, মুসলমানেরা তাদের সামান্য সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠতাহেতু মন্ত্রিসভায় কিঞ্চিৎ প্রাধান্য লাভ করলে হিন্দুরা তাতে ক্ষুন্ন হবেন, কেন না বাংলার বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে এটা অনিবার্য বলে তাঁরা ইতিপূর্বেই মেনে নিয়েছেন।

হিন্দুদের অন্তর্নিহিত শক্তি

এমতাবস্থায়, বাংলার জনসাধারণের একটি অংশ, যথা মুসলিম সম্প্রদায়, অপর একটি যথা হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর জুলুমশাহী কায়েম করতে পারবে বলে সত্যি কি কেউ কল্পনা করতে পারেন? এই রকম জুলুমশাহীর অসম্ভাব্যতা ও অবিশ্বাস্যতার একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ ধরা যাক হিন্দুদের আভ্যন্তরীণ শক্তির কথা। এই শক্তির সুবাদে তাঁরা যে কোন জালেম সরকারকে পঙ্গু ক'রে ফেলতে পারেন। প্রশাসনব্যবস্থার সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদেই তাঁরা অধিষ্টিত রয়েছেন। সশস্ত্র বাহিনীতে তাঁদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা সেক্রেটারিয়েটে ক্ষমতার রজ্জুটি তাঁদেরই হাতে ধরা। সরকারের সবচাইতে প্রভাবশালী ও ঝানু আমলার সবাই হিন্দু। তাঁদের পদমর্যাদা ও প্রভাব উপেক্ষা করা যাবে, কল্পনা করাও অবাস্তব।

এ ছাড়াও বাংলার সীমান্তে থাকবে ২০ কোটি হিন্দুর অধিবাস। এই প্রদেশে তাদের স্বধর্মীদের প্রতি সুবিচার করা হচ্ছে কিনা সে-দিকে তারা নিশ্চয়ই নজর রাখবে। বাংলার হিন্দুদের প্রতি কোন রকম জুলুম অবিচার করা কোন মুসলিম সরকারের পক্ষে আহাম্মকী বৈ কিছু হবে না—এবং তেমন আহাম্মকী হবে আত্মহত্যারই সামিল।

বাংলার হিন্দু সমাজের প্রতি সরকারের তথাকথিত অসদাচরণ সম্পর্কে চরম বিষোদগারে ভরা অভিযোগ আমি পড়েছি। এ সব অভি-যোগ খুবই নাজুক ও কাল্পনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি এ-কথা কোনক্রমেই স্বীকার করবো না যে, বঙ্গবিভাগের দাবী এমন কি পশ্চিম বঙ্গের অধিকাংশ হিন্দু সমর্থন করেন, সমগ্র বঙ্গের অধিকাংশ হিন্দুর কথা তো ছেড়েই দিন।

বাংলার অঞ্চল নির্বিশেষে হিন্দুদের সংস্কৃতি ও নাড়ীর সম্পর্ক এতো গভীর ও অবিচ্ছেদ্য যে এমন কি অঞ্চল বিশেষে ক্ষমতা দখলের আশাও এই সম্পর্কচ্ছেদ করা তাঁরা তাঁদের স্বার্থের অনুকূল বিবেচনা করবেন না।

বস্তুতঃ, অনুরূপ কারণেই বঙ্গবিভাগ প্রশ্নে বাংলার হিন্দু, মুসলমান, তফসিলী নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মতামত গ্রহণ করতে হবে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যদি বঙ্গবিভাগের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন কেবল তাহলেই বাংলাকে ভাগ করা যাবে। অর্থ-নৈতিক অখণ্ডতা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও বাংলার ক্ষেত্রে এইসব মৌলিক কারণের জন্যই ভারত বিভাগের মুসলিম দাবী থেকে বঙ্গবিভাগের প্রশ্নটি স্বতন্ত্রভাবে বিচার করতে হবে।

বঙ্গবিভাগের দাবীতে হিন্দু মহাসভা অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তারা আশা করছে যে বঙ্গবিভাগের দাবীতে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলে, বাংলা সরকারের পতন ঘটিয়ে ৯৩ ধারা জারীর পর একাধিক

আঞ্চলিক মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলার মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মোন্মত্ততা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি ক'রে এবং হরতাল ও হিংস্র অভিযানের মাধ্যমে গোলযোগ সৃষ্টি ক'রে তারা হিন্দু সমাজের আনুকূল্য লাভ ও সেই সুবাদে কংগ্রেসের প্রভাব নির্মূল করতে পারবে। হিন্দু মহাসভা পুনরায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভের অভিলাষী। তেমনি অভিলাষী রয়েছেন আরো অনেক রাজনীতিক যাঁরা এ-যাবৎ রাজনীতিক্ষেত্রে ইঞ্চি পরিমাণ ঠাঁই ক'রে নিতেও অসমর্থ হয়েছেন।

হিন্দু সমাজের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ এই আন্দোলনের হোতা। এ-কথা সত্যি যে তাদের পেছনে রয়েছে একটি প্রভাবশালী পত্রিকা মহলের সমর্থন এবং প্রচারণার ক্ষেত্রে তাদের পারদর্শিতা অদ্বিতীয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের অনুমাত্র সমর্থন নেই তাদের আন্দোলনের পেছনে। গত নির্বাচন সংশয়াতীতরূপে সপ্রমাণ করেছে যে, হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস দলের মধ্যে কোনটিই তফসিলী সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিত্ব করে না। যুক্ত নির্বাচনে সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশন প্রার্থীরা পরাজিত হলেও প্রাথমিক নির্বাচনে তাঁরা কংগ্রেস মনোনীত তফসিলী সম্প্রদায় ভুক্ত প্রার্থীদের চাইতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভ করেন।

এছাড়া, বর্ণহিন্দুদের মধ্যেও এমন কয়েকটি শ্রেণী আছে যারা আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ণহিন্দু ব'লে চিহ্নিত হলেও কংগ্রেস কিংবা হিন্দু মহাসভার অনুসারী নয়। অধিকারভোগী শ্রেণীগুলির স্বার্থে পরিচালিত প্রশাসন অপেক্ষা সাধারণ মানুষের স্বার্থে পরিচালিত প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েম হলেই এরা বেশী সুখী হবে। কংগ্রেস কিংবা হিন্দু মহাসভার পরিচালিত সরকার যে বিশেষ অধিকারভোগী শ্রেণীগুলির স্বার্থেই পরিচালিত হবে সে সম্পর্কেও এরা অবহিত, কারণ সেই শ্রেণীগুলি হচ্ছে এ সব দলের শক্তির আসল উৎস।

কাজেই বঙ্গবিভাগের দাবীটি হিন্দুদের মধ্যে ততো ব্যাপক ও সার্বজনীন নয় যতটা সপ্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যদিও প্রচারণার

ঢক্কা-নিনাদে এর উল্টোটা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস লক্ষ্য ক'রা যায়। এমন একটি থানাও নাই যেখানে অনুন্নত অংশসহ বর্ণহিন্দু শ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ প্রসঙ্গে ১৯৪১ সালের আদমশুমারী পরীক্ষা করে দেখলে চমৎকৃত হবেন। মুসলমানেরা দাবী করেছেন যে ১৯৪১ সালের আদমশুমারীতে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। এই আদম-শুমারীর কাজ কয়েকদিন যাবৎ চলে এবং এতে হিন্দুদের প্রতি অযথা আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়। ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে সংখ্যার গুরুত্বই হবে সর্বাধিক ব'লে হিন্দু মহাসভা যে ব্যাপক প্রচারণা চালায়, তার উদ্দেশ্য অনুসারেই হিন্দু সম্প্রদায় এই প্রচারণাকে এই অর্থেই গ্রহণ করে যে, আদমশুমারীতে তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেখানোর জন্যে তাদের সর্বাত্মক ভাবে চেষ্টিত হওয়া উচিত।

এর ফলেই দেখা যায় যে, যদিও হিন্দু অর্থনীতিবিদেরাই বিশেষ গুরুত্বের সংগে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা একটি ক্ষয়িষ্ণু জাতি এবং তার বিপরীতে মুসলমানেরা একটি বর্দ্ধিষ্ণু ও সন্ততি বহুল জাতি, তবুও আলোচ্য আদম শুমারীতে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যার অনুপাত ১৯৩১ সালের সমানই রয়ে গেছে।

১৯৪১ সালের আদমশুমারী

১৯৪১ সালের আদম শুমারীতে হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি বিপুল কিন্তু অনির্দিষ্টসংখ্যক অংশ তারা কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত তা' ঘোষণা করতে অস্বীকার করেছে। স্মর্তব্য যে, সে সময়ে তফসিলী সম্প্রদায় গুলোর মধ্যে এই মর্মে একটি ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছিলো যে তাদের কোন বর্ণ উল্লেখ না ক'রে শুধু হিন্দু ব'লে ঘোষণা করাই উচিত হবে। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যারা নিজেদের বর্ণ ঘোষণা করে নাই তাদের সকলে না হ'লেও অধিকাংশই তফসিলভুক্ত। এমন কি বর্দ্ধমান জেলায় বর্ণ হিন্দুদের সংখ্যা শতকরা ৩২·৩৬ এবং অঘোষিত বর্ণের হিন্দুদের সংখ্যা শতকরা ১৮·৬। এই জেলার প্রত্যেক

মহকুমায়ও সংখ্যার এই অনুপাত দেখা যায়। বীরভূম জেলায় বর্ণহিন্দু ও অঘোষিত বর্ণের হিন্দুর সংখ্যা শতকরা হিসাবে যথাক্রমে ২৯'০৪ ও ৯'৭১ এবং জেলার দুইটি মহকুমায়ও এই অনুপাতের প্রতিফলন ঘটেছে।

বগুড়া জেলায় বর্ণহিন্দুদের সংখ্যা শতকরা ৪৮'৭৪ ও অঘোষিত বর্ণের হিন্দুদের সংখ্যা শতকরা ৭'৪৩। এমনকি এই জেলায়ও বর্ণ হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয় এবং অঘোষিত বর্ণের হিন্দুদের সহযোগেও তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিমাণ দাঁড়ায় খুবই নগণ্য।

মেদিনীপুর জেলায় বর্ণ হিন্দুদের সংখ্যা শতকরা ৪২'৫৬ এবং অঘোষিত বর্ণের হিন্দুদের সংখ্যা শতকরা ৩০'৮৭। সদর মহকুমায় এই সংখ্যার অনুপাত যথাক্রমে ৪৬'৬৪ ও ১৭'২৩। ঝাড়গ্রাম ও ঘাটালে যথাক্রমে ৫২'৪৫ ও ৪'৭৬ এবং ৬৩'১৪ ও ১১'৫৭। শেষের এই দুইটি মহকুমায়ই তাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। তমলুক (তাম্রলিপ্ত) ও কোনতাইয়ে এই সংখ্যানুপাত যথাক্রমে ৩৯'৭৮ ও ৪০'৪৫ এবং ২৬'৪৫ ও ৬০'৯১।

হুগলী জেলায় এই সংখ্যানুপাত ৪৫'৪৯ ও ১৬'৪৮। সদরে ৩৬'২০ ও ১৬'৩৫, শ্রীরামপুরে ৪৬'২৯ ও ২২'৯, আরামবাগে ৫৪'৭৮ ও ৪'৮।

হাওড়া জেলায় ৩৭'৬৯ ও ২৯'৪৫। সদর মহকুমা ও উলুবেড়িয়ায় ২৬'৮৯ ও ৪২'৭১ এবং ৫১'২৭ ও ১২'৭৭। বস্তুতঃ এই জেলার কয়েকটি থানায় অঘোষিত বর্ণের হিন্দুদের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও বর্ণহিন্দুরা সংখ্যালঘু হবে এবং অপর কয়েকটি থানায় মুসলিম সম্প্রদায়, এমন কি তফসিলী সম্প্রদায়, একক সংখ্যাগুরু।

প্রেসিডেন্সী বিভাগের সমগ্র ২৪ পরগণা জেলায় বর্ণহিন্দু ও অঘোষিত বর্ণের হিন্দুদের সংখ্যানুপাত ২২'১০ ও ২২'২৩। মুসলিম ও বিঘোষিত তফসিলী সম্প্রদায় (অঘোষিত বর্ণের হিন্দুদের হিসাবের মধ্যে না ধ'রেও) এখানে সংখ্যাগুরু। সদর মহকুমায় মুসলমান ও

তফসিলী বর্ণের হিন্দুদের সম্মিলিত সংখ্যা শতকরা ৫৬, বর্ণ হিন্দুদের সংখ্যা শতকরা ১৪'৯ ও অঘোষিত বর্ণের হিন্দুদের সংখ্যা ২৬ ৯১।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা

মেটিয়াবুরুজ ও ভাঙ্গার থানায় মুসলমানদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ব্যারাকপুর মহকুমায় বর্ণ হিন্দু ও অঘোষিত বর্ণের হিন্দুদের সংখ্যা যথাক্রমে ২৬'৪৭ ও ৩৯'৬। বারাসতে মুসলমানদের সংখ্যা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ শতকরা ৫৭'৬৫ এবং তফসিলী, বর্ণ হিন্দু ও অঘোষিত বর্ণের হিন্দুদের সংখ্যা যথাক্রমে ১৩'৪৮, ১৫'৯১ ও ১২'১৫। এই মহকুমার একমাত্র রাজারহাট ছাড়া অপর সকল থানায় মুসলমানদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। উক্ত রাজারহাট থানায় মুসলমান ও তফসিলী হিন্দুদের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৪'৮ ও ৩১'৭১। বসিরহাট মহকুমায় মুসলমানদের সংখ্যা ৪২'৩৩, তফসিলী হিন্দুদের সংখ্যা ২৩'৩২, বর্ণ হিন্দুদের ১৭'৮৩ ও অঘোষিত বর্ণের হিন্দুদের ১০'৭৩। ৬টি থানার মধ্যে ৪টিতেই মুসলমানদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং অপর দুইটিতেও তফসিলী হিন্দুদের সমবায়ে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ডায়মণ্ড হারবার মহকুমায়ই মুসলমানেরা সংখ্যা শক্তিতে সবচাইতে দুর্বল। সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ২২'৬২, তফসিলীদের ২৬'৩, বর্ণ হিন্দুদের ৩৫'১৮ ও অঘোষিত বর্ণের হিন্দুদের ১০'০৫।

এমনকি যদি ধ'রে নেয়া যায় যে বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের সকলেই বঙ্গভঙ্গের সমর্থক (আমি তা বিশ্বাস করি না) তবুও সে দাবী যে কত সীমিত এই পরিসংখ্যান তথ্যই সকল বাগাড়ম্বর থেকে তার সবচাইতে জোরালো প্রমাণ।

নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও যশোর জেলায় মুসলমানদের সংখ্যা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ। খুলনা জেলার ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে। এই জেলায় মুসলমানদের সংখ্যা ৪৯'৩৬, তফসিলী হিন্দুদের ২৪'২১, বর্ণহিন্দুদেব ১৬'৫১ ও অঘোষিত বর্ণের হিন্দুদের সংখ্যা ৯'৫৯।

থানাওয়ারী বিশ্লেষণ

তবে বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা মহকুমায় মুসলমানেরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাগেরহাট মহকুমায় থানাওয়ারী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মুসলমানেরা তিনটি থানায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ, ৪টি থানায় প্রায় সমান সমান ও একটি থানায় তাদের সংখ্যা ৩৮·৭২ ও তফসিলীদের ১৭। সাতক্ষীরা মহকুমায় মুসলমানেরাই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়।

উত্তর বঙ্গের কয়েকটি এলাকার উপর দাবী প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি সেখানের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো।

রাজশাহী জেলায় মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৭৪·৬৬। কাজেই এই জেলার কথা ছেড়েই দিলাম।

দিনাজপুর জেলায় মুসলমানদের সংখ্যা ৫০·২০, তফসিলী সম্প্রদায়গুলির ২০·৭৩, বর্ণ হিন্দুদের ১৭·২১ ও অঘোষিত বর্ণের হিন্দুদের ২·২৬। দিনাজপুরের সদর মহকুমায় এবং রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, পাবনা ও মালদহ জেলায় মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

জলপাইগুড়িতে মুসলিম, তফসিলী, বর্ণহিন্দু ও অঘোষিত বর্ণের হিন্দুদের সংখ্যা ২৩·০৮, ২৯·৮৮, ১৪·২৩ ও ৬·৫৩ এবং এছাড়াও সেখানে রয়েছে "অন্যান্য" শ্রেণীভুক্ত এক বিপুল জনসমষ্টি, যাদের সংখ্যা ২৬·২৮। জলপাইগুড়ির সদর মহকুমায় এই সংখ্যানুপাত ২৮·৮২ ৩৩·৫৬, ৩·২২, ৬·১৫ ও "অন্যান্য" ১৮·২৬।

আজব আবদার

জলপাইগুড়ির অংশবিশেষ বিচ্ছিন্ন করে পশ্চিম বঙ্গের সংগে জুড়ে দেবার অদ্ভূত দাবীটির মধ্য দিয়েই সপ্রমাণ হয় বঙ্গভঙ্গের প্রবক্তারা কতটা মাত্রাজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছেন।

দার্জিলিং জেলাকে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করতে হবে। এই জেলার জনসংখ্যার বিপুল অংশ নেপালী ও গিরিজন-অধ্যুষিত। কাজেই বর্তমান আলোচনায় এই জেলাকে সামিল করা যায় না।

আমি সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য ও পরিসংখ্যান জনসমক্ষে পেশ করলাম। এখন আমাদের বিচার ক'রে দেখতে হবে বঙ্গভঙ্গের দাবী সমগ্র বাংলায়—কিংবা, এমনকি শুধু পশ্চিম বঙ্গে—প্রকৃত প্রস্তাবে কতখানি জনসমর্থনপুষ্ট হতে পারে।

তবে তার আগে বঙ্গভঙ্গ দাবীর গ্রাহ্যতার প্রশ্নটি আরেকবার পরখ করে দেখা যেতে পারে। বাঙ্গালী হিন্দুরা কেন একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি দাবী করতে যাবেন?

তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম যে দাবীটি শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজন বর্ণ হিন্দুর নয়, বরং নির্বিশেষে সকল বর্ণহিন্দু, তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু ও অঘোষিত বর্ণের হিন্দুদের। বর্তমান প্রশাসনের অধীনে তাদের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি; কি করে তাঁরা ভাবতে পারেন যে ভবিষ্যতে কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থাধীনে তাঁরা দুর্গত হবেন এবং তাঁদের জীবন, সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তার জন্য একটি ক্ষুদ্র পশ্চিম বঙ্গ রাষ্ট্রের পত্তন অপরিহার্য? আমার তো মনে হয় হিন্দুদের নিজস্ব স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকেই এই দাবীর প্রতিষ্ঠা আত্মঘাতী হবে। এমনকি যদি এমন একটি কল্পনাতীত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যেখানে বাংলার সমগ্র শাসন ক্ষমতা পুরোপুরি মুসলমানদের কব্জাগত হয়ে যায় এবং সে কারণে গোটা হিন্দু সমাজ একটি নিরেট বিরোধী শক্তিতে পরিণত হয়ে যায় তাহলে সেই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে অনুরূপ একটি মুসলিম সরকার কি তাঁদের নীতি কার্যকরী করতে পারবেন—সরকারী চাকুরেদের অধিকাংশ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও? শিল্প, বাণিজ্য ও সকল পেশাও তাঁদেরই হস্তগত। তাঁদের যুবশ্রেণীও প্রাগ্রসর, অধিকার সচেতন ও দাবী আদায়ে সক্ষম। কাজেই, বঙ্গভঙ্গের দাবীতে সূচিত মনোবৃত্তি শুধু অধৈর্য, নৈরাশ্য ও অদূরদর্শিতা প্রসূত নয়, এটি এমন একটি গভীর পরাজয়বাদী মনোভাবের দ্যোতক যা বাংলার মহান হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছ থেকে কেউ আশা করতে পারে না।

অখণ্ড স্বাধীন রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কাঠামোতে কি পরিণাম আশা করা যেতে পারে তার নির্দেশক হিসাবে প্রায়ই নোয়াখালীর ঘটনার উল্লেখ করা হ'য়ে থাকে। আগেই বলেছি, বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্ভূত কোন ঘটনার নিরীখে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনের প্রয়াস হাস্যকর হবে। তবুও ঘটনাটি বিচার করে দেখা যাক। নোয়াখালীতে অনুষ্ঠিত ঘটনাকে কি ভবিষ্যতের মানদণ্ড ও পূর্বগামিনী ছায়া ব'লে বিবেচনা করা যায়? আরো কি অগণিত জেলা নাই যেখানে মুসলমানেরা বিপুল পরিমাণে সংখ্যা-গরিষ্ঠ? সে সব জেলায় কি শান্তি অব্যাহতরূপে বিরাজমান নাই এবং হিন্দুরা পূর্বের মতোই নিজেদের অধিকার ও প্রতিপত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নাই?

এবার আসুন ভেবে দেখি বাংলা অবিভক্ত থাকলে তার অবস্থান কি হবে। বাংলা হবে একটি মহান দেশ, ভারতের মধ্যে সবচাইতে ধনাঢ্য ও ঋদ্ধিশীল রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র তার অঙ্কে লালিত জনগণকে দিতে পারবে এক সমুন্নত জীবনযাত্রার মান, যেখানে এক মহান জাতি তার বিকাশের উন্নততম সোপানে আরোহণ করতে পারবে, এবং সত্যিকার অর্থে প্রাচুর্যে ভরা হবে যে দেশ। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য হবে সমৃদ্ধিশালী, এবং কালের আবর্তনে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ও প্রগতিশীল রাষ্ট্ররূপে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে সেই দেশ। বাংলা যদি অবিভক্ত থাকে তাহলে তার এই ভবিষ্যৎ কল্পরূপ শুধু স্বপ্ন-বিলাস বা আকাশ কুসুম চিন্তা মাত্রে পর্যবসিত হবে না। বাংলার অন্তর্নিহিত সম্পদ ও তার উন্নয়নের বর্তমান পর্যায় সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন যে এই হবে ভবিষ্যতের বাংলার রূপ, যদি না তার আগেই আমরা স্বখাত সলিলে ডুবে মরি।

আমি বরাবরই বাংলার ভবিষ্যৎ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে কল্পনা ক'রে এসেছি, কোনরূপ ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘের অংশ হিসাবে নয়। অনুরূপ কোন রাষ্ট্র একবার সংস্থাপিত হলে, তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তারই উপরে। আমি কখনোই ভুলতে পারবো না ভারত সরকারের কত দীর্ঘদিন লেগেছিলো ১৯৪৩ সালের বাংলার মন্বন্তরের গুরুত্ব অনুধাবন করতে,

কিভাবে বাংলার চরম দুর্দিনে প্রতিবেশী বিহার প্রদেশ তাকে খাদ্যসরবরাহ করতে অস্বীকার করেছিলো, কিভাবে ভারতের আর সব কয়টি প্রদেশ বাংলার প্রতি তাদের দ্বার রুদ্ধ ক'রে রেখেছে ও বাংলাকে তার নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করে চলেছে, কিভাবে ভারতের দরবার-কক্ষে বাংলাকে ঠেলে দেয়া হয় মর্যাদার-আলোক-বঞ্চিত এক অখ্যাত কোণে আর অন্য প্রদেশগুলি তাদের আসন দখল করে বসে দোর্দণ্ড প্রতাপে।

বাংলা যদি মহান হতে চায় তবে সে শুধু নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই তা' হতে পারবে। তাকেই নিজের সম্পদের অধিকারী ও নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা হতে হবে। বাংলার উপর অন্যের শোষণের উচ্ছেদ করতে হবে, ভারতের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বাংলাকে বলি দেয়া আর চলবে না। শেষ পর্যায়ে বিরোধ বাঁধবে কলকাতা ও তার অব্যবহিত পরিপার্শ্বকে ঘিরে। কারণ প্রধানতঃ অন্যান্য প্রদেশ থেকে আগত লোকেদের অবদানেই গড়ে উঠেছে কলকাতা; বাংলার মাটিতে তাদের কোন শেকড় নেই, তারা এখানে এসেছিলো শুধু জীবিকার্জন করতে, কিংবা, অন্য দৃষ্টিতে, বাংলাকে শোষণ করতে। কিন্তু বড়ই আফসোসের কথা, উপরে আলোচিত পরিসংখ্যানের প্রেক্ষিতে, এই যদি হয় বঙ্গ-বিভাগ আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য, তাহলে এই আন্দোলন শুধু এই উদ্দেশ্যের স্থির বিন্দুতেই সীমিত থাকবে না, অপিচ এই বিভাগের ভ্রূণ থেকেই জন্ম নেবে এমন বৈরিতা ও জিঘাংসা যার শেষ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কেউ তা জানে না। কাজেই, হিন্দু সমাজের যে মুষ্টিমেয় কয়েক-জন লোক এতো হাল্কা-ভাবে বাংলাকে ভাগ করার কথা বলেন তাঁদের কাছে আমার আবেদন: অশেষ ক্ষতি ও দুর্ভোগের ধাত্রী এই আন্দোলন প্রত্যাহার করুন। আমরা সকলে একাগ্র হ'য়ে উদ্যোগী হলে নিশ্চয়ই এমন একটি ভবিষ্যৎ শাসন প্রকল্প উদ্ভাবন করতে পারবো যা জন-গণের সকল অংশের সন্তোষলাভে সমর্থ হবে ও বাংলার ঋদ্ধি সমুজ্জ্বল গৌরবদীপ্ত অতীতকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুলতে পারবে।

পরিশিষ্ট—খ

[অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হিন্দু মহাসভাপন্থী ও অন্যরা যে সমালোচনা করেন তার জবাবে প্রদত্ত জনাব সোহরাওয়ার্দীর বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ। ৮ই মে, ১৯৪৭ তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত।]

আমার অবিভক্ত সার্বভৌম বাংলা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও অন্যান্য নেতা বিবৃতি প্রদান করেছেন। এই বিবৃতিগুলিতে একাধারে মুসলমানদের প্রতি গভীর সন্দেহ ও অবিশ্বাস এবং বাংলার অন্ততঃ একটি অংশে হিন্দুরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর দোর্দণ্ড প্রতাপে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে এই আশার ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়।

অবাস্তব স্বপ্নচারিতা

এই স্বপ্নে তাঁরা এতো বিভোর হয়ে গেছেন যে, এর ফলে তাঁদের সব বিচারবুদ্ধি, আপোষকামিতা ও মুসলমানদের সংগে সহযোগিতার ইচ্ছা তিরোহিত হয়ে গেছে মনে হয়। তাঁরা এটা বুঝে উঠতে পারছেন না যে, তাঁদের বাংলা হবে একটি নগণ্য অকিঞ্চিৎকর সত্তা, ভারতের সংঘ সম্মেলনে যার জন্যে বরাদ্দ হবে পেছনের কাতারের একটি তাচ্ছিল্যভরা আসন।

বিশেষ ক'রে শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী অত্যন্ত হিংস্র ভাষায় ও মাত্রাতিরিক্ত অমার্জিত কটূক্তির মাধ্যমে তাঁর মনের ভার লাঘব করেছেন। বারংবার বাংলার হিন্দুদের তথাকথিত অসহায় অবস্থার অভিযোগের পুনরুক্তি ক'রে তিনি বিশ্বকে এবং খুব সম্ভব নিজেকেও বিশ্বাস করাতে চান যে বাংলা যদি সত্যি অবিভক্ত থেকে যায় তাহলে হিন্দুদের আর গতি নাই।

তিনি এমনকি বাংলার হিন্দুদের অবস্থাকে নরককুণ্ডের সংগেও তুলনা করেছেন। তবে এই নরকটি এমনই বিশেষ অধিকার, বিত্ত ও শক্তিবৈভবে সম্পৃক্ত যে বাংলার মুসলমানেরা একেই তাদের আশা আকাঙখার লক্ষ্যবস্তু বলে গণ্য করে এবং এর দূরতম ছায়ামাত্রেও বাস করতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করবে।

রূঢ় ভাষা ও কটূক্তি

রূঢ়তা ও কটূকাটব্যের প্রয়োজন কি? আমাকে নিন্দা ক'রে, আমার আন্তরিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে, আমার কৃতির বিদ্রূপ ও অকৃতির সমালোচনা করে এবং বাংলার সকল দুর্গতির দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে লাভ কি? এতে ক'রে শুধু যাদের মুসলিম নিন্দা ও মুসলিম বিদ্বেষে দীক্ষিত ক'রে গ'ড়ে তোলা হয়েছে তাদের হিংসা ও বিদ্বেষের আগুনে ইন্ধন জোগানো হবে এবং মুসলমানদের সম্পর্কে হীনতম ধারণায় বিশ্বাসী করে তোলা হবে।

তিনি ও তাঁর সমমনা বন্ধুরা এই অনস্বীকার্য সত্যটি উপেক্ষা করছেন যে, যে ভবিষ্যৎ স্বাধীন বাংলাকে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন বা তদনুরূপ অন্য কোন বাহ্যিক কাঠামোর উপর নির্ভর না করে বরং জনগণের বিশেষ করে হিন্দুদের মতো অপরিমেয় প্রতিপত্তির অধিকারী সম্প্রদায়ের, স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহযোগিতার উপর নির্ভর করতে হবে সে রাষ্ট্রের রাজনীতি অবিশ্যি স্বতন্ত্র প্রকৃতির হতে বাধ্য। বাঙ্গালী জাতি অবিভক্ত থেকে পরস্পরের সহযোগিতার ভিত্তিতে কেমনতরো কল্যাণ ভবিষ্যতের সৃষ্টি করতে পারে তার সাথে বর্তমান সরকার বা মন্ত্রিসভার অভিযুক্ত ত্রুটিবিচ্যুতির, কিংবা এমন কি আমার বর্তমান অবস্থান ও ব্যক্তিত্বের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

অদূরদর্শিতা

আমি তাঁদের কিছু দেবার প্রস্তাব করছি না। বাংলার জনগণই স্থির করবেন তাঁরা একসাথে থেকে তাঁদের ভাগ্য নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণ করবেন কিনা। অসংখ্য অপহ্নুতিতে সীমিত বর্তমানের নিরীখে স্বাধীন বাংলার ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্দেশের প্রয়াস অদূরদর্শিতা বৈ কিছু নয়।

এ ছাড়া, শ্রীমুখার্জী কি এই সত্যটি অনুধাবনে অপারগ যে বাংলা ও অবশিষ্ট ভারতের সমস্যার মধ্যে রয়েছে স্বাতন্ত্র ও বৈচিত্রের দুস্তর ব্যবধান; বাঙ্গালীরা একজাতি, এক ভাষাভাষী ও পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সার্বজনীন কল্যাণকর্মে উদ্যোগী হতে সক্ষম বলে ভারত উপমহাদেশের অন্তর্গত সকল মানুষেরও জাতি এক, ভাষা এক, স্বার্থ অভিন্ন এবং এমন কি তাদের ইতিহাসও এক বলে ধরে নেয়া যায় না।

সমগ্র ভারতে এবং ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে হিন্দুরা বিপুল পরিমাণে সংখ্যাগরিষ্ঠ। অথচ বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিমাণ খুবই স্বল্প, এবং বৃহত্তর বাংলায় এই পরিমাণ স্বল্পতর হবে।

বাংলার হিন্দুরা তাঁদের অবস্থান, মর্যাদা ও সংখ্যাশক্তির সুবাদে কোনরূপ রক্ষাকবচের মুখাপেক্ষী নন; পক্ষান্তরে ভারতের মুসলমানেরা তাঁদের সম্পদ ও সংখ্যাগত দুর্বলতা হেতু দেশ বিভাগের ফলে সৃষ্ট রক্ষাকবচের মুখাপেক্ষী। বাংলায় হিন্দুরা তাঁদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি শিক্ষা পদ্ধতি ও ধর্মাচারের অধিকারী। পক্ষান্তরে ভারতের মুসলমানদের ভাষার উপর হামলা হচ্ছে, তাদের সাহিত্যকে বিকৃত করা হচ্ছে, তাদের শিক্ষাগত প্রগতি ব্যাহত করা হচ্ছে এবং অসংখ্য এলাকায় আইন করে তাদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের পূর্ণ ও অবাধ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

সমগ্র ভারতে এবং ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে, মুসলমানেরা শাসন ক্ষমতায় যদি কোন অংশ পায় তা হবে খুবই নগণ্য। পক্ষান্তরে, বাংলার প্রশাসনে হিন্দুরা অনিবার্যভাবে যে ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হবে তা হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মুসলমানদের প্রায় সমতুল্য। কাজেই, ভারতের মুসলমানদের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ভারতের দ্বিধা-বিভক্তি অপরিহার্য বলে বাংলার হিন্দুদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বাংলারও দ্বিধাবিভক্তি অপরিহার্য এ কথা বলা যায় না।

এই পার্থক্যগুলির উপর আরো বেশী জোর দেয়ার কোন প্রয়োজন নাই। শ্রী মুখার্জীর মতে, হিন্দুপ্রধান ও মুসলিমপ্রধান দুইটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট সমাধান। সমাধান তো দূরের কথা, এই রকম পরিস্থিতিতে এক সম্প্রদায়ের অত্যধিক প্রাধান্যের জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে অবশ্যম্ভাবীরূপে অবদমিতের মনোভাব সংক্রমিত হবে এবং তার ফলে সংখ্যালঘু নৈতিক মনোবল ক্ষুন্ন ও মানসিক তথা সাংস্কৃতিক বিকাশ ব্যাহত হবে।

এর চাইতে আমি যে বিকল্পের প্রস্তাব করছি—যেখানে, সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায় জনবলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রায় সমান এবং সমধিক প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য এবং সেহেতু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে অবদমিতের মনোভাব সংক্রমণের প্রশ্নই উঠতে পারে না—তেমন একটি ব্যবস্থা কি শতগুণে শ্রেষ্ঠ নয়? আমার প্রস্তাবিত প্রকল্পে একদলীয় শাসনের কোন স্থান থাকতে পারে না। বাংলাকে কেন্দ্রের সাথে যুক্ত রাখতে হবে এই নীতির পেছনে যে মনোভাব ক্রিয়া-শীল রয়েছে ব'লে আমার মনে হয় তা হচ্ছে: যেহেতু বাংলার হিন্দুরা স্বাধীন যুক্ত বাংলায় নিধন হ'য়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা, সেহেতু হিন্দু-প্রধান কেন্দ্রের সাথে বাংলাকে জুড়ে রেখে বাঙ্গালী হিন্দুর জীবন, স্বাধিকার ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে হবে।

নৈতিক দুর্বলতা

বাংলার হিন্দুকে আত্মরক্ষার জন্য একটি দূরপ্রক্ষিপ্ত কেন্দ্রের উপর নির্ভর করতে হবে—এটি কি একটি পরাজিতের মনোভাব ও নৈতিক দুর্বলতার স্বীকৃতি নয় ?

তাঁদের জিজ্ঞেস করছি—কোথাও কারু ওপর অন্যায় প্রাধান্য চাপিয়ে দেয়া কি আর সম্ভব ? ভূ-ভারতে বাংলার মতো জায়গায় হিন্দুদের ভয়ের কি কারণ থাকতে পারে ? প্রাধান্য বিস্তারের দিন বাসী হয়ে গেছে। যে প্রবল পরাক্রমশালী বৃটিশ শক্তি এতো দীর্ঘ দিবস যামিনী ধ'রে ভারতের উপর দোর্দণ্ড প্রতাপ চালিয়ে এসেছে সেই বৃটিশ শক্তি পর্যন্ত পরিশেষে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, গায়ের জোরে মোড়লী দিন আর নাই। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বজ্রকঠোর সংকল্পের মুখে কোন জাতি বা শক্তিই আর অপরের উপর নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে পারবে না। বৃটিশের মতো শক্তি যেখানে ব্যর্থ হয়েছে ভারতের অপর কোন জাতি কি সেখানে সফল হতে পারবে ?

আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি বাংলার হিন্দু নেতারা ভারতের হিন্দু নেতাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করছেন। ভারতের অন্যান্য স্থানের হিন্দু নেতারা ভালো করেই জানেন যে বঙ্গবিভাগ বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জন্য হবে তাদের আশা, আকাংখার গোরস্থানের সামিল, তবুও তাঁরা বাংলাকে নিজের স্বার্থের দাবায় খুঁটি হিসেবে ব্যবহারের পুরাতন খেলায় বাংলার হিন্দু নেতাদের উপর চাপ প্রয়োগ করছেন বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য। আখেরে বাঙ্গালী জাতির জীবনে ভাগ্যের কি বিপর্যয় ঘটবে তা' নিয়ে তাঁদের কোন মাথা ব্যথা নাই।

তাঁরা অবশ্যই জানেন যে, বিভক্ত বাংলা হবে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের লোকদের শোষণ ও মুনাফা শিকারের অবারিত মৃগয়াক্ষেত্র।

সবার উর্দ্ধে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে আমার বিবৃতির

শেষ অনুচ্ছেদের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে। সেখানে আমি কলকাতার কথা উল্লেখ করেছি, শুধু কলকাতাকে ঘিরে যে বিপদের বাস্তব আশঙ্কা রয়েছে সেই দিকে তর্জনী সংকেতের উদ্দেশ্যে। আমি শুধু সেই সত্য-টাই উল্লেখ করেছি যে সত্যটা সবাই জানেন: বঙ্গভঙ্গের দাবী আসলে কলকাতাকে কুক্ষিগত করার অপপ্রয়াস বৈ আর কিছুই নয় এবং এই-ভাবে তাঁরা মুসলমানদেরকে ব্যবসা ও বানিজ্য থেকে বঞ্চিত করবে।

তবে আমি এ-ও বলেছি যে, কলকাতার মতো এমন দুর্লভ ধন অত সহজলভ্য নয়, শুধু হঠকারিতাপূর্ণ বিবৃতির জোরে এমন ধন হাতিয়ে নেয়া যায় না। তাছাড়া, কলকাতা যদি বিরোধের কাঁটাই হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তার আর অবশিষ্ট থাকবে কি? কলকাতাকে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বাঁচিয়ে রাখতে হলে (কলকাতায়) শান্তি ও নিরাপত্তা অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

আমি প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ও যুক্ত নির্বাচনের প্রশ্ন এড়িয়ে গেছি বলে একটি মন্তব্য কোথায় যেন পড়েছি। আমি কখনো নিজেকে বাংলার জনগণের ভবিষ্যৎ বন্ধক রাখার মতো শক্তিধর স্বৈরতন্ত্রী বলে মনে করিনি। আমি সুপারিশ করেছি যে, বাংলার ভবিষ্যৎ রূপ কি হবে তা হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই সাব্যস্ত হবে, তাঁদেরই কর্তব্য হবে সম্মেলনে মিলিত হয়ে বাঙ্গালীর আশা-আকাঙখাকে বাস্তবরূপ দানের কাজে ব্রতী হওয়া।

আমি এখনো সবার প্রতি সেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তাঁদের কাছে আমার প্রার্থনা: বাংলাকে ধ্বংস করবেন না, দ্বেষ ও হিংসায় অন্ধ হবেন না, আত্মঘাতী ভ্রাতৃবিরোধে লিপ্ত হবেন না, বরং সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করে এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করুন বাংলাকে স্বাধীন ও স্বনির্ভর করুন, যে বাংলা হবে আপন ভাগ্য ও বৈভবের নিয়ন্তা, যদৃচ্ছা চুক্তি ও মৈত্রী সম্পাদনে সক্ষম, বিশ্বের জাতি নিচয়ের মধ্যে আপন মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত এবং মাটির মানুষের সুখের স্বর্গ।

পরিশিষ্ট—গ

[কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী জনগণের কাছে শান্তিরক্ষার আবেদন জানিয়ে যে ভাষণ দান করেন তার পূর্ণ বিবরণ। ভাষণটি ১৯৪৭ এর ২রা এপ্রিল অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে প্রচারিত হয়।]

এই নৈরাজ্যের অবসান করুন, এই নিষ্করুন জিঘাংসার যবনিকা-পাত করুন। আসুন, আমরা সবাই মিলে এই শপথ নিই, শান্তি ও সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করবো এবং শান্তিপ্রতিষ্ঠার পর আমাদের রাজনৈতিক ভাগ্যে যে কোন বিপর্যয়ই ঘটুক না কেন তা যেন শান্তিকে পুনরায় বিঘ্নিত করতে না পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করবো। আমি আবেদন করছিঃ এই নৃশংসতার অবসান করুন—আপনাদের নারী ও শিশুদের কল্যাণের স্বার্থে, শান্তি সম্প্রীতি ও শৃঙখলার স্বার্থে, এর অবসান করুন সেই সব নিরপরাধ নির্বিত্ত মানুষের স্বার্থে যারা কোন দিন কারু কিছু ক্ষতি করেনি কিন্তু অবস্থাবৈগুন্যে বিপদ জেনেও স্ত্রী-পুত্র পরিজনদের জীবিকার সন্ধানে বাইরে যেতে বাধ্য হয়।

কলকাতার যে সব হিন্দু ও মুসলমানেরা এখনো মানুষের উপর আঘাত হানায়, বোমানিক্ষেপে, গুলিবর্ষণে, এসিড প্রয়োগে ও পথ-চারীদের ছুরিকাঘাতদানে লিপ্ত রয়েছেন তাঁদের প্রতি আমার আকুল আবেদন, এই বর্বরতা বন্ধ করুন। এতে কার কি লাভ হতে পারে? প্রতিটি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি, আপনাদের সকল নেতা, তরুণেরা ও ছাত্রসম্প্রদায় এইসব কার্যকলাপের নিন্দা করেছেন। মিঃ জিন্নাহ ও মিঃ গান্ধীর মতো জনবরেণ্য নেতারাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এর নিন্দা করেছেন এবং আপনাদের কাছে আবেদন করেছেন এ থেকে বিরত হবার জন্য।

আপনারা এঁদের উভয়কে না হলেও যে কোন একজনকে নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা করেন, কাজেই তাঁদের যুক্ত আবেদন অবশ্যই আপনাদের অন্তর স্পর্শ করতে ব্যর্থ হবে না। ভেবে দেখুন, এখানে একজন মুসলমানকে ঘায়েল করে কিংবা ওখানে একজন হিন্দুকে খতম ক'রে আপনার কী পরমার্থ উদ্ধার হচ্ছে। আপনাদের কেউ কেউ হয়তো অন্য কোন স্থানের অনুরূপ দুষ্কৃতির বদলায় এটা করছেন বলে ভাবছেন।

আপনাদের কাছে আমি বারংবার আবেদন করেছি নিজের হাতে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা থেকে বিরত থেকে সরকারের উপর ন্যায়-বিচারের ভার ছেড়ে দিতে। আপনারা নিজের চোখেই দেখেছেন কোথাও কোন দুষ্কৃতি সংঘটিত হলে সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে পিছপা হন না। তবু কেন নিজের হাতে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবেন? বস্তুতঃ এই প্রতিহিংসার অন্ত নেই। একটি প্রতিহিংসার অমোঘ ফলশ্রুতি আরেকটি প্রতিহিংসা। আপনার সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা অন্য সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির যে তাজা খুনে রঙ্গীন করেছেন তা পরিণামে আপনার সম্প্রদায়েরই কোন ব্যক্তির তাজা খুনের অমোঘ প্রতিশ্রুতি, কেননা আপনার প্রতিহিংসার প্রতিক্রিয়ায় অন্যত্র আপনারই সমধর্মা এমন কোন ব্যক্তি নিহত হবেন যাঁর ওপর বহুজনের জীবন ও জীবিকা নির্ভর করে।

যে বিভীষিকার করাল ছায়া আজ আমাদের দেশকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে তাকে অপসারণ করুন। মাটির ধূলোয় মিশিয়ে ফেলুন এই অশুভ শক্তিকে। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল নাগরিকের কাছে আমার আবেদন: আপনারা সম্প্রদায়গতভাবে পরস্পরের সংগে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন করুন, ভাই ভাই সম্পর্কের ভিত্তিতে আরো বেশী মেলা-মেশা করুন, যুক্তভাবে শান্তি মিছিল শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান করুন, ঘরে ঘরে এই বাণী পৌছে দিন যে, বিশৃঙখলা ও অরাজকতা কারুরেই অভিপ্রেত নয় এবং যারা এই সব দুষ্কৃতি ও নৃশংসতায় লিপ্ত হয় বা অপরকে লিপ্ত হতে প্ররোচনা দেয় তারা আমাদের জাতির বীর সন্তান নয় বরং তারা স্রষ্টা, সৃষ্টি, সমাজ ও স্ব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী।

পরিশিষ্ট—ঘ

[২৯ শে এপ্রিল, ১৯৪৭ সালে প্রদত্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল হাশিমের বিবৃতি।]

সময় হয়েছে সত্যকে দিনের আলোকে উদ্ভাসিত করার। সস্তা জনপ্রিয়তা ও সুযোগসন্ধানী নেতৃত্বের মোহে ক্লিষ্ট মানসিকতার বশবর্তী হওয়া চিন্তার পতিতাবৃত্তি বৈ কিছু নয়। এই সেদিন ১৯০৫ সালেও বাংলা ছিলো ভারতের চিন্তানায়ক; সেদিন প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধেও সাফল্যজনকভাবে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলো বাংলা। কি দুর্ভাগ্য সেই বাংলা আজ চিন্তার ক্ষেত্রে দেউলিয়া এবং পথ নির্দেশের জন্য পরদেশী নায়কের মুখাপেক্ষী। ভাবতে বিস্ময় লাগে বাংলার যে হিন্দু-সমাজ সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ মুখার্জী চিত্তরঞ্জন দাস ও সুভাষচন্দ্র বসুর মতো পুরুষ সিংহের জননী ছিলো সে হিন্দু সমাজের আজ হলো কি?

ভারতের আজিকার বিপ্লবী চিন্তাশৈলীর জন্মভূমি বঙ্গদেশ। সত্যি-কার বিপ্লবের উৎস অন্তর্ঘাতী দ্বন্দ্ব নয়; চিন্তায় ও মানসে সৃজনোন্মুখ বিপ্লবী চেতনার উন্মেষই হচ্ছে তার জন্মলগ্ন। বাংলাকে আজ আবার তার সকল হীনমন্যতা ও পরাজয়ী মনোবৃত্তির দীনতা ঝেড়ে ফেলে নিজের বিস্মৃত ঐতিহ্যে পুনরাবর্তন করতে হবে এবং তার প্রতিভার উচ্চতম শিখরে অরোহণ করে আপন ভাগ্যের নিয়ন্তা হতে হবে। বস্তুনিষ্ঠ চিন্তার প্রকোষ্ঠে আবেগ ও ভাবালুতার কোন স্থান নাই। বর্তমানের বিভ্রান্ত চিন্তার বৈকল্য যেন আমাদের ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত না করে।

বিদেশী শোষণের চারণক্ষেত্র

বাংলা আজ তার ভাগ্যের এক ক্রান্তি লগ্নে সমুপস্থিত। তার সামনে দুইটি পথ খোলা আছে—একটি স্বাধীনতা ও গৌরবের, অপরটি

অনন্তকালের জন্য দাসত্ব শৃঙখল ও অশেষ নির্যাতনের। বাংলাকে এখানেই এখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। মানুষের জীবনে কখনো কখনো এমন শুভলগ্ন দেখা দেয় যে লগ্নের মাহেন্দ্রক্ষণে যাত্রারম্ভ হলে তা পরম সৌভাগ্যের অব্যর্থ লক্ষ্যেই সমাপ্ত হয়। সুযোগ একবার হারালে আর কখনো নাও আসতে পারে।

বাংলাকে শোষণের জন্য বিনিয়োগকৃত ভারতীয় ও মার্কিন ইঙ্গ বিদেশী পুঁজির শতকরা একশত ভাগই পশ্চিম বঙ্গে লগ্নিকৃত। আমাদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা লক্ষ্য করে এই বিদেশী শোষকেরা তাদের সম্পত্তি বাজেয়াফত হবার ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। অবিভক্ত ও স্বাধীন বাংলায় তাদের দশা কি হতে পারে সেটা আন্দাজ করতে পারার মতো বিচক্ষণতা তাদের আছে। এই বিদেশী পুঁজির স্বার্থেই বাংলাকে এমনভাবে বিভক্ত, বিকলাঙ্গ ও প্রাণশক্তিহীন করার চক্রান্ত করা হচ্ছে যাতে করে বাংলার বিচ্ছিন্ন অংশ দুইটির কোনটিরই আর এমন বুকের পাটা থাকবে না যে তারা ভবিষ্যতে এই পুঁজির অবাধ শোষণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে।

বাংলার সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক গোলযোগের প্রকৃতি দৃষ্টে আমার মনে হয় যে, ইঙ্গ-ভারতীয় কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠী ও তাদের ভারতীয় মিত্রদের প্রেরণা ও উৎসাহই এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে। সাধারণ কানুনের অধীনে সম্ভ্রান্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রার্থীদের আগ্নেয়াস্ত্রের লাই-সেন্স পেতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। অথচ বিপুল পরিমাণ বৃটিশ ও মার্কিন ছাপ-মারা পরিত্যক্ত আগ্নেয়াস্ত্র হিন্দু ও মুসলমান গুণ্ডাদের মধ্যে অকাতরে বিতরণ করা হচ্ছে, আর এই গুণ্ডারাই সচেতনভাবে বা অজ্ঞাতসারে বাংলার দ্বিধাবিভক্তির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বাংলার জনৈক দিক্‌পাল, যিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর গদীর মোহে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন, একবার আমার কাছে মন্তব্য করেন যে, যেহেতু তাঁর সবকিছুই অতীত এবং ভবিষ্যৎ বলতে তাঁর কিছুই নাই, সেহেতু

সমুপস্থিত বর্তমান তাঁকে যা-কিছু দিতে পারে তাই তিনি দুবাহু বাড়ায়ে লুফে নেবেন। তাঁর সুবিধাবাদের নৈয়ায়িক ভিত্তি রচনা করেন তিনি এভাবেই। বাংলার অপসৃয়মান অতীতের ধ্বংসাবশেষ যাঁরা, বাংলার দ্বিখণ্ডিতকরণে তাঁদের কিছু নগদপ্রাপ্তি যোগ ঘটতে পারে বৈ কি, কিন্তু যে তরুণ বাংলার সব কিছুই রয়েছে ভবিষ্যতের গর্ভে তাদের কি হবে? অবস্থাগুণে প্রতিপত্তির আসনে আসীন মুষ্টিমেয় কয়েকজন সুবিধাবাদী ব্যক্তির সঙ্কীর্ণ স্বার্থের যূপকাষ্ঠে তরুণ বাংলা কি তার গোটা ভবিষ্যৎকে বলি দেবে?

বাংলাবিভাগের দাবী ভারত বিভাগের সমান্তরাল বলে তুলনা করা যায় না। চিন্তার যে শোকাবহ বিকৃতির ফলে এ কথা ভাবা যায় যে, পাকিস্তান দাবীকে নস্যাৎ করার জন্য বাংলাবিভাগের দাবীই হচ্ছে মোক্ষম অস্ত্র তার নিদেন হচ্ছে লাহোর প্রস্তাবের তাৎপর্য ও অন্তর্বস্তু সম্পর্কে পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা; লাহোর প্রস্তাব কোন মনগড়া ভাষ্য নয়, বরং তার মূল স্বরূপ ও অন্তর্বস্তুর প্রতিই ভারতের মুসলমানেরা অবিচলিত-ভাবে আনুগত্যশীল। প্যালেস্টাইনে যেভাবে শক্তির নীতি প্রয়োগ করে বিদেশী লোকেদের আমদানীর মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সৃষ্টি করা হচ্ছে কিংবা তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে যেভাবে লোকবিনিময়ের মাধ্যমে তা' করা হয়েছিলো, সেভাবে একটি অখণ্ড মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা কৃত্রিম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা সৃষ্টি কখনোই সে প্রস্তাবের লক্ষ্য ছিলো না।

"সারা দুনিয়ায় মুসলিম সংখ্যাগুরু বলে মসহুর যে সব দেশ আছে, সে সব দেশের পূর্ণ সার্বভৌমত্বই শুধু দাবী করা হয়েছে লাহোর প্রস্তাবে, এবং এই দাবীর তাৎপর্য অনুসরণ করলে সহজেই বোধগম্য হবে যে, ভারত ভূ-খণ্ডের অন্তর্গত সকল দেশ ও জাতির পূর্ণ সার্বভৌমত্ব ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারই এই প্রস্তাবের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য। এতে বাংলার তথা অন্যান্য ভারতীয় সাংস্কৃতিক অঞ্চলের পূর্ণ সার্বভৌমত্বের ব্যবস্থা রয়েছে;

আর সেই সাথে সবার কল্যাণে এবং সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা সৃষ্টির দ্বারও অবারিত রাখা হয়েছে।

পাকিস্তান দাবীর তাৎপর্য এ নয় যে, বাংলায় বা পাঞ্জাবে মুসলমানেরা শাসকজাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অন্যান্যরা হবে তাদের অধীন শাসিত জাতি। কায়েদে আজম বোম্বের জিন্নাহ-গান্ধী আলোচনার ব্যর্থতার পর সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে, সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিতে সমগ্র জাতির অভিপ্রায় ও অভিরুচি অনুসারেই স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রসমূহের প্রশাসনকার্য নির্বাহ করা হবে। এই ঘোষণার সাথে আমি শুধু যোগ করতে চাই যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতিতে, যদি না সংখ্যালঘুরা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের তাগিদে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি দাবী করে বসেন।

ভাগ্য-শিকারের মৃগয়া ক্ষেত্র

সমুন্নতমানের নেতৃত্বের অভাবে দেশ আজ নীচাশয় ভাগ্য-শিকারীদের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বাংলার হিন্দু মুসলমান যুবশ্রেণীকে তাই ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে বহির্দেশীয় প্রভাবের উঞ্ছবৃত্তির নিগড় থেকে স্বদেশের মুক্তি সাধন ক'রে তাকে হৃত মর্যাদার মহিমাময় আসনে পুনরাভিষিক্ত করার এবং ভারত ও বহির্বিশ্ব উভয় ক্ষেত্রেই জাতিনিচয়ের সম্মিলনীতে আপন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করার মহান ব্রতে। বাংলার যুবশক্তিকে অতীত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারেই গড়ে তুলতে হবে তার চরিত্রের বুনিয়াদ, অতীত গৌরবের অনুধ্যানেই লাভ করতে হবে বর্তমান সংগ্রামের প্রেরণা।

বাংলার হিন্দু ও মুসলমান তাদের স্বতন্ত্র সত্তার বিলোপ সাধন না করেও বাংলার নৈসর্গিক প্রতিবেশ ও জলবায়ুর প্রভাবের সংগে সংগতি রেখে যৌথ উদ্যোগে এমন একটি সুমহান সাধারণ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে, মানব সভ্যতার বিবর্তনে পৃথিবীর অন্য কোন জাতির তুলনায়ই যার কণ্ঠিভূষণ কোন অংশে অকিঞ্চিৎকর নয়।

মুসলমানদের 'শরিয়ত' অনুসারে মুসলিম সমাজের এবং হিন্দুদের 'শাস্ত্র' অনুসারে হিন্দু সমাজের কর্মকাণ্ডের ধর্মীয় অনুশাসনের অধিকার ছাড়া, স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রে হিন্দু ও মুসলমানের কোন স্বতন্ত্র বিশেষ অধিকার সংরক্ষিত থাকবে না। ব্যতিক্রম সিদ্ধ অধিকারটিই হচ্ছে মুসলমানদের পাকিস্তান সৃষ্টিজনিত আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের প্রত্যক্ষ নিদেন, আর হিন্দুদের জন্য এই অধিকারটিরই অবিসংবাদিত অবদান হবে তাদের নিজস্ব আদর্শ ও স্বকীয় বৈশিষ্টমণ্ডিত ভূয়োদর্শন বিকাশের জন্য একটি বাধাবন্ধনহীন নিরীক্ষাক্ষেত্র লাভ।

বাংলায় হিন্দুদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। কাজেই স্বাধীন বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থায় তাদের ন্যায্য অংশ থেকে এবং তাদের সম্পদের অধিকার ভোগ থেকে হিন্দুদের বঞ্চিত করা হবে এটা অভাবনীয়। বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সংখ্যার অনুপাত প্রায় সমান সমান। কোন সম্প্রদায়ের পক্ষেই অপর সম্প্রদায়ের উপর প্রাধান্য বিস্তার করা সম্ভব নয়। বাংলা যদি তার সমস্ত সম্পদ শুধু তার মাটির সন্তানদের কল্যাণে নিয়োগ করতে পারার সুযোগ পায় তাহলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই অনাগত বহু শতাব্দী ধরে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হতে পারবে।

কিন্তু বাংলা যদি দ্বিখণ্ডিত হয়, তাহলে পশ্চিম বাংলা বিজাতীয় ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের একটি দূর-প্রত্যন্তের প্রদেশমাত্র কিংবা সম্ভবতঃ উপনিবেশমাত্র, ব'লে বিবেচিত হবে। বাংলার বিভাগ থেকে হিন্দু নেতাদের প্রত্যাশা যতই উচচ হোক না কেন, আমার কাছে কেবল এ সম্ভাবনাটিই স্ফটিক স্বচ্ছরূপে প্রতিভাত হচ্ছে যে, তাঁরা শুধু একটি বিদেশী পুঁজিবাদের দাসখতে বাঁধা দিন-মজুরের কঠোর ভাগ্যেই অভিশপ্ত হবেন।

মারাত্মক ভুল

পরাধীনতা ও দাসত্ব শৃঙখলে লাঞ্ছিত বর্তমানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ভবিষ্যতের রূপ কল্পনা করা একটা মারাত্মক ভুল হবে। বাংলার

যুগব্যাপী একদলীয় মুসলিম শাসনের ফলে হিন্দু মানসে একটা অমূলক সন্দেহ প্রবণতা বাসা বেঁধেছে। কিন্তু সততার খাতিরে এ কথাটা স্বীকার করতেই হবে যে, বাংলা লীগ কিংবা অখিল ভারত মুসলিম লীগ হিন্দু-দের খাঁটি প্রতিনিধিদের সাথে কোয়ালিশন করতে কখনোই পরাঙমুখ ছিলো না। আইন সভায় মুসলিম লীগ দল বরাবর এই রকম কোয়ালি-শন গঠন করার চেষ্টা করে এসেছে, কিন্তু কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের হস্তক্ষেপের ফলে সে চেষ্টা কখনো সফল হতে পারেনি। মন্ত্রিসভা গঠন করার আগে কংগ্রেসের সহযোগিতা লাভের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করেছিলেন জনাব সোহরাওয়ার্দী।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, মিঃ গান্ধী নোয়াখালী যাত্রার প্রাক্কালে ৪০ নং থিয়েটার রোডে আমাদের সংগে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করে ছিলেন : "কোয়ালিশনের প্রতি আমার বিশেষ আসক্তি নেই। এক-দলীয় সরকারেই আমি বিশ্বাস করি। সেজন্যেই বাংলায় কোয়ালিশন হতেই হবে আমি এমন ধারণা পোষণ করি না।" উল্লেখযোগ্য যে, সে সময়ে একমাত্র বাংলায়ই একটি মুসলিম মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন ছিলো। এখানে কোয়ালিশন গঠন করা হলে ভারতের অন্যান্য স্থানেও কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনা দেখা দিত। কাজেই এখানে হিন্দুরা যেমন শাসন ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হন, তেমনি মুসলিম লীগাররা বঞ্চিত হন অন্যত্র।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অভিশাপ ও বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হতে পারলে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানেরা শান্তিপূর্ণভাবে ও সন্তোষ-জনক পদ্ধতিতে নিজেদের সমস্যাবলী সমাধান করতে পারতো। দুর্ভাগ্যবশতঃ আইন সভার মুসলিম সদস্যরা সব সময়ই বেশী উৎসাহী ছিলেন মন্ত্রিসভা রদবদলের সতরঞ্চ খেলায়। ভালো মন্দ কোন রকম নীতি বা কর্মসূচীর বালাই নিয়ে সময় নষ্ট করার অবকাশ তাঁদের ছিলো না। আমার দুঃখ শুধু এই যে, ১৯৩৫ সালের আইনের অধীনে গঠিত

এই হতচ্ছাড়া মন্ত্রিসভায় এমন কি আছে তা' আমি বুঝে উঠতে পারি না।

যে-কারণেই হোক, কিংবা তা একেবারে অকারণে হলেও, মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের মনে একটা সন্দেহের ভাব দানা বেঁধে উঠেছে। কাজেই এখন মুসলমানদের করণীয় হচ্ছে, বক্তৃতা বিবৃতির বাগাড়ম্বরে নয় বরং কাজের মধ্য দিয়ে তাঁদের কাছে সপ্রমাণ করা যে, তাঁদের এই সন্দেহ অমূলক। বর্তমানের এই অশান্তি, চিন্তার বিকৃতি ও আত্মঘাতী চক্রান্ত-প্রবণতা সমাজদেহের ব্যাধিরই লক্ষণ। এর একমাত্র প্রতিষেধক হচ্ছে স্বাধীন সত্তায় বিভূষিত একটি অবিভক্ত সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র রচনায় উৎসর্গিত প্রজ্জ্বলন্ত দেশপ্রেমের হোমানল।

চিত্তরঞ্জন দাস আজ লোকান্তরিত। তাঁর বিদেহী আত্মা আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের নির্মাণকর্মে চলার পথের দিশারী হোক। বাংলার হিন্দু ও মুসলমান, আসুন আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাভোগের ক্ষেত্রে তাঁর প্রস্তাবিত ৫০:৫০ হারাহারি শরীকানার ফর্মুলা বরণ করে নিই। বাংলার অতীত ঐতিহ্যরাজি ও মহিমাদীপ্ত ভবিষ্যতের নামে শপথ নিয়ে আমি আবার আহ্বান জানাচ্ছি বাংলার তরুণ গোষ্ঠীর কাছে: আপনারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসুন, প্রতিক্রিয়ার দুর্গ মরণ আঘাতে চুরমার ক'রে আসন্ন বিপর্যয় থেকে বাংলাকে রক্ষা করুন।

পরিশিষ্ট—৬

[লাহোর প্রস্তাব। আনুষ্ঠানিক ভাবে পাকিস্তান প্রস্তাব বলে অভিহিত। অখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ উত্থাপিত ও ২৪শে মার্চ গৃহীত। প্রস্তাবক: বাংলার জনাব এ, কে, ফজলুল হক।]

১। "শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে অখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিল ও ওয়ার্কিং কমিটি যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন এবং যার প্রতিফলন ঘটেছে তাদের গৃহীত ১৯৩৯ সালের ২৭শে আগষ্ট ও ১৭ ও ১৮ই সেপ্টেম্বর এবং ১৯৪০ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখের প্রস্তাবাদিতে, অখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশন তার প্রতি সমর্থন ও অনুমোদন জ্ঞাপন করে দৃঢ়তার সংগে পুণর্ঘোষণা করছে যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে সন্নিবদ্ধ ফেডারেশন পরিকল্পনা এই দেশের বিশেষ অবস্থাবলীর প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণরূপে অনুপযোগী ও অকার্যকরী এবং মুসলিম ভারতের কাছে সর্বাংশে অগ্রহণযোগ্য।

২। "এই অধিবেশন অধিকন্তু এই দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করছে যে, ভাইসরয় বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৩৯ সালের ১৮ই অক্টোবর প্রদত্ত এক ঘোষণায় ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫-এর নীতি ও পরিকল্পনা ভারতের বিভিন্ন দল, স্বার্থগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংগে আলোচনাক্রমে পুনর্বিবেচনা করা হবে বলে যে ঘোষণা প্রচার করেছেন তা' আশ্বাসজনক ; তবে, গোটা শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাটি আগাগোড়া নতুন করে পুনর্বিবেচিত না হওয়া পর্যন্ত মুসলিম-ভারত সন্তুষ্ট হবে না ; মুসলমানদের সম্মতি ও অনুমোদন ব্যতীত প্রণীত কোন সংশোধিত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাও তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩। "প্রস্তাব করা যাচ্ছে যে—অখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশনের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, কোন প্রকার শাসনতান্ত্রিক

পরিকল্পনাই এই দেশের জন্য কার্যোপযোগী কিংবা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না তা' নিম্নোক্ত মৌলিক নীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যথা: ভৌগোলিকভাবে পরস্পরসম্বন্ধ এলাকাগুলো নিয়ে অঞ্চলের সীমারেখা নির্ধারণ করা হবে এবং এই অঞ্চলগুলো যথাপ্রয়োজন আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাসসহ এমনভাবে গঠন করা হবে যে, ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলগুলোর মতো যে সব এলাকায় মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সে সব এলাকা যুথবদ্ধ ভাবে গঠিত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের রূপ পরিগ্রহ করবে। এই স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহে প্রতিটি অঙ্গ ইউনিট স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম হবে।

"এই সকল অঞ্চলের ও ইউনিটের সংখ্যালঘুদের সংগে আলোচনাক্রমে তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কার্যকরী ও বাধ্যতামূলক রক্ষাকবচসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে সংবিধানে সংগৃহীত করতে হবে; এবং ভারতের অন্যান্য অংশে, যে সব স্থানে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু সে সব স্থানে মুসলমানদের ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংগে আলোচনাক্রমে তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রশাসনিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কার্যকরী ও বাধ্যতামূলক রক্ষাকবচসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে সংবিধানে সংগ্রথিত করতে হবে।

"এই অধিবেশন ওয়ার্কিং কমিটিকে এই মৌলিক নীতিমালার অনুসরণে একটি শাসনতন্ত্রের রূপরেখা প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করছে; অনুরূপ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় অঞ্চলসমূহ কর্তৃক চূড়ান্ত পর্যায়ে সকল ক্ষমতা—যথা: প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, যোগাযোগ, শুল্ক ও প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য বিষয় গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হবে।"

পরিশিষ্ট—চ

[১৯৪৬ সালের ৯ই এপ্রিল দিল্লীর এ্যাংলো-এ্যারাবিক কলেজে অনুষ্ঠিত লেজিসলেটর্স কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাব। দিল্লী প্রস্তাব নামেই সমধিক পরিচিত। প্রস্তাবক: বাংলার জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী।]

"যেহেতু এই বিশাল ভারত উপমহাদেশের ১০ কোটি মুসলমান এমন একটি ধর্মমতে বিশ্বাস করেন যা' তাঁদের জীবনের শৈক্ষিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল দিক নিয়ন্ত্রণ করে, যা শুধু আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান মাত্রে সীমিত থাকে না, এবং সহস্র বর্ষের নির্মম বর্ণপ্রথার অভিশাপে ৬ কোটি মানুষকে অস্পৃশ্যের পর্যায়ে অবনমনকারী এবং অস্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদের দুর্লঙঘ্য প্রাচীর গড়ে তোলার ও দেশের জনগণের বিপুল অংশের উপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য চাপিয়ে দেয়ার জন্য দায়ী যে হিন্দু ধর্ম ও দর্শন মুসলিম, খৃষ্টান তথা সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনুদ্ধারযোগ্য দাস শূদ্রের স্তরে অবনমিত করবে বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে তার সাথে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসের সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে;

"যেহেতু হিন্দু সম্প্রদায়ের বর্ণ, প্রথা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সাম্য ও ইসলামের অপর সকল মহান আদর্শের পরিপন্থী;

"যেহেতু স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক পশ্চাৎপট, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাসের ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের পক্ষে সাধারণ আশা আকাঙক্ষায় উদ্দীপিত হয়ে একটিমাত্র ভারতীয় জাতিতে বিকশিত হওয়া সম্ভব নয়, এবং যেহেতু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাশাপাশি বাস করার পরেও এখনও তারা দুইটি প্রধান ও স্বতন্ত্র জাতি হিসেবেই বিদ্যমান রয়েছে;

"যেহেতু বৃটিশ সরকার ভারতে পাশ্চাত্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন-ভিত্তিক গণতন্ত্রের আদর্শের অনুসারী রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থা প্রবর্তনে যে-নীতি গ্রহণ করেছেন তার ফলে কোন জাতির বা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অপর জাতি বা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে পারে, যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলোতে অধিষ্ঠিত গত আড়াই বছরের কংগ্রেস শাসনামলে যখন মুসলমানেরা অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা ও নির্যাতনে জর্জরিত হয়ে উপলব্ধি করতে পারেন যে শাসনতন্ত্রে ও গভর্ণরের নির্দেশাবলীতে প্রদত্ত তথা-কথিত রক্ষাকবচগুলি বাস্তবে সম্পূর্ণরূপে অকার্যকরী প্রতিপন্ন হয়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, এবং এই অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যদি একটি অবিভক্ত ভারত ফেডারেশন গঠন করা হয় তাহলে এমনকি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতেও তাঁদের ভাগ্য এর চাইতে কিছু প্রসন্ন হবে না এবং কেন্দ্রে স্থায়ী হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতিপক্ষে তাঁদের অধিকার ও স্বার্থ কোনক্রমেই যথো-পযুক্তরূপে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে না।

"যেহেতু মুসলমানদের দৃঢ় বিশ্বাস, মুসলিম ভারতকে হিন্দু পরা-ক্রমের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং তাকে নিজস্ব প্রতিভা অনু-সারে বিকশিত হবার পূর্ণ সুযোগদানের জন্য উত্তর পূর্ব অঞ্চলের বাংলা ও আসাম এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান নিয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা একান্ত প্রয়োজন, সেহেতু :

"ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহের মুসলিম লীগ সদস্যদের এই কনভেনশন গভীর বিবেচনার পর এতদ্বারা ঘোষণা করছে যে, মুসলিম ভারত কোনক্রমেই একটি অবিভক্ত ভারত শাসনতন্ত্র মেনে নেবে না ও অনুরূপ উদ্দেশ্যে গঠিত কোন শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী সংস্থায় অংশগ্রহণ করবে না ; বৃটিশ সরকার কর্তৃক ভারতের

জনগণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য উদ্ভাবিত কোন ফর্মুলাই ভারতীয় সমস্যাটির সমাধানের সহায়ক হবে না, যদি না তা' আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙখলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নিম্নোক্ত ন্যায়নীতি ও সুবিচারের আদর্শভিত্তিক নীতিমালার সংগে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, যথা :

(১) ভারতের উত্তর-পূর্বে বাংলা ও আসাম এবং উত্তর পশ্চিমে পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান সমন্বয়ে গঠিত মুসলিম প্রধান অঞ্চলসমূহকে, তথা পাকিস্তান অঞ্চলসমূহকে, নিয়ে একটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে; পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রকল্প অবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য দ্ব্যর্থহীন প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

(২) পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের জনগণ তাঁদের স্ব স্ব সংবিধান প্রণয়নের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র সংবিধান প্রণয়নকারী সংস্থা গঠন করবেন।

(৩) পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের সংখ্যালঘুদের জন্য ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ লাহোরে গৃহীত অখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রস্তাব অনুসারে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর স্বীকৃতি ও অবিলম্বে এই দাবীর বাস্তবায়ন কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে মুসলিম লীগের সহযোগিতা ও অংশগ্রাহিতার পূর্ব-শর্ত ।

এই কনভেনশন দৃঢ়তার সংগে আরও ঘোষণা করছে যে, মুসলমানদের দাবীর পরিপন্থী অবিভক্ত ভারতভিত্তিক কোন শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেয়ার কিংবা কেন্দ্রে জবরদস্তিমূলক কোন অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার চেষ্টা করা হলে, জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে সর্বতোভাবে তার প্রতিরোধ করা ছাড়া মুসলমানদের আর কোন গত্যন্তর থাকবে না।

পরিশিষ্ট—ছ

[১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দল হিসাবে প্রতিষ্ঠা-লাভের পর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ যে ১২-দফা কর্ম-সূচী পেশ করে তার পূর্ণ বিবরণ।]

১। পাকিস্তান একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হবে। পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবেন জনসাধারণ।

২। রাষ্ট্রের দুইটি আঞ্চলিক ইউনিট থাকবে–পূর্ব ও পশ্চিম।

৩। অঞ্চলগুলি লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে। প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক (রাজনৈতিক) ও মুদ্রা ব্যবস্থা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। অন্য সকল বিষয় ইউনিটগুলির উপর ন্যস্ত থাকবে।

৪। সরকারী পদাধিকারী ব্যক্তিরা কোন বিশেষ সুবিধা বা অধি-কারভোগী হবেন না কিংবা প্রয়োজনাতিরিক্ত বেতন বা ভাতার অধি-কারী হবেন না।

৫। সরকারী কর্মচারীরা সমালোচনার অধীন হবেন, কর্তব্য-সম্পাদনে ব্যর্থতার জন্যে তাঁদের পদচ্যুত করা যাবে এবং অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে তাঁদের ছোটখাটো বা বড় রকমের সাজা দেয়া যাবে। আদালতে তাঁরা কোন বিশেষ সুবিধার অধিকারী হবেন না, কিংবা আইনের চোখে তাঁদের প্রতি কোনরূপ পক্ষপাত প্রদর্শন করা হবে না।

৬। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল নাগরিক সমান অধিকার ভোগ করবেন—যথা: বাকস্বাধীনতা, দলগঠনের স্বাধীনতা, অবাধ গতিবিধি ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের অধিকার।

৭। সকল নাগরিকের যোগ্যতানুসারে বৃত্তি অবলম্বনের অধিকার থাকবে এবং তাঁদের যথাযোগ্য পারিশ্রমিক দেয়া হবে।

৮। সকল পুরুষ ও নারীর জন্যে শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে।

৯। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোতে সকল নাগরিকের যোগদানের অধিকার থাকবে। একটি বিশেষ বয়ঃসীমা পর্যন্ত সকলের জন্য সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নিজস্ব স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর ইউনিট গঠন করা হবে।

১০। মৌলিক মানবিক অধিকারসমূহ দেয়া হবে এবং কোন অবস্থাতেই কাউকে বিনাবিচারে আটক রাখা হবে না। বিনাবিচারে কাউকে দণ্ডদান বা নিধন করা হবে না।

১১। বিনা খেসারতে জমিদারী ও অন্য সকল মধ্যস্বত্ব বিলোপ করা হবে। সকল আবাদযোগ্য জমি পুনর্বণ্টন করা হবে।

১২। সকল জমি জাতীয়করণ করা হবে।

পরিশিষ্ট—জ

[১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে অনুষ্ঠিত গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল কনভেনশনে গৃহীত শাসনতন্ত্রের বিকল্প মূলনীতি প্রস্তাব।]

নাম ও বৈশিষ্ট্য

১। রাষ্ট্রের নামকরণ করা হবে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র (ইউনাটেড ষ্টেটস অব পাকিস্তান)।

২। পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র দুইটি অঞ্চল সমবায়ে গঠিত হবে।

৩। বহির্ভূত, অংশত বহির্ভূত, কেন্দ্রীয় সরকার শাসিত বা দেশীয় রাজ্য ব'লে অভিহিত কোন এলাকা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে থাকবে না। অনুরূপ যে কোন আকারে বিদ্যমান সকল এলাকা গণভোটের মাধ্যমে ব্যক্ত সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের অভিপ্রায় ও সম্ভাব্যতার বিচার অনুসারে সংলগ্ন প্রদেশের বা প্রদেশসমূহের অঙ্গীভূত হবে কিংবা স্বয়ং প্রদেশ বা প্রদেশ সমূহরূপে গঠিত হবে।

৪ক। পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হবে।

রাষ্ট্রপ্রধান

৪। পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের একজন রাষ্ট্রপ্রধান থাকবেন।

৫। পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্র-প্রধানের উপর ন্যস্ত থাকবে। তিনি আইন ও সংবিধান অনুসারে এই ক্ষমতা ব্যবহার করবেন।

৬। রাষ্ট্রপ্রধান ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনা ও ঐচ্ছিক ক্ষমতা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে যে-সব ক্ষেত্রে বিধান করা হবে

তা ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে, "রাষ্ট্রপ্রধান" বলতে মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে কার্যনির্বাহনকারী রাষ্ট্রপ্রধান বোঝাবে।

রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন

৭। রাষ্ট্রপ্রধান কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নির্বাচিত হবেন। কিন্তু তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য হতে পারবেন না।

৮। রাষ্ট্রপ্রধান বিদায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের মেয়াদপূর্তির ৬০ দিনের বেশী আগে ও ৩০ দিনের বেশী পরে নির্বাচিত হবেন না।

কার্যকালের মেয়াদ

৯। রাষ্ট্রপ্রধানের কার্যকাল কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে পাঁচ বছর হবে।

১০। মৃত্যু, পদত্যাগ, অপরাগতা বা অপসারণের ফলে রাষ্ট্রপ্রধানের পদে শূন্যতা সৃষ্টি হলে, নয়া রাষ্ট্রপ্রধানের কার্যকাল পাঁচ বছর হবে।

রাষ্ট্রপ্রধানের অপসৃতি

১১। দেশদ্রোহিতা ও অসদাচরণের অভিযোগে ফেডারেল পার্লামেণ্ট পরিষদের মোট সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় রাষ্ট্রপ্রধানকে অপসারণ করতে পারবেন।

১২। অপসারণ, মৃত্যু, পদত্যাগ, অপারগতা বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপ্রধানের পদে শূন্যতা দেখা দিলে নয়া রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত পার্লামেণ্টের স্পীকার রাষ্ট্রপ্রধানের কার্যভার গ্রহণ করবেন।

১৩। রাষ্ট্রপ্রধানের পদে শূন্যতা সৃষ্টির নব্বই দিনের মধ্যে নয়া রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করতে হবে।

রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতাবলী ও দায়িত্বসমূহ

১৪। রাষ্ট্রপ্রধানের কৃপাপ্রদর্শনের ক্ষমতা থাকবে।

১৫। পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের উপর রাষ্ট্র-প্রধানের অধিনায়কত্ব ক্ষমতা (কমাণ্ড) থাকবে।

১৬। তিনি স্বীয় বিচার বিবেচনার ভিত্তিতে পাকিস্তান যুক্ত-রাষ্ট্রের নির্বাচনী কমিশনার, অডিটর জেনারেল ও সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ দান করবেন।

১৭। তিনি পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজন কোন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই অন্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করবেন।

১৮। তিনি বিদেশী কূটনীতিকদের স্বীকৃতিদান করবেন, রাষ্ট্র-দূতদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করবেন এবং সকল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন সংগঠন

১৯। পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেণ্ট এক-কক্ষবিশিষ্ট হবে।

২০। পার্লামেণ্টের অধিবেশন পর্যায়ক্রমে ফেডারেল রাজধানীতে ও পূর্বাঞ্চলের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হবে।

২১। পার্লামেণ্টের সদস্যগণ উভয় অঞ্চলের সমান প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ও যুক্তনির্বাচন পদ্ধতিতে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

২২। পার্লামেণ্টের আয়ুষ্কাল হবে চার বছর।

২৩। নির্বাচনী কলেজের পার্লামেণ্ট সদস্যদের প্রত্যাহার করার অধিকার থাকবে।

২৪। বছরে অন্যূন দুইটি অধিবেশনের অনুষ্ঠান করতে হবে এবং শেষ অধিবেশনের শেষ দিন থেকে পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম দিনের মধ্যে ছয় মাসের অধিক সময়ের ব্যবধান থাকতে পারবে না।

২৫। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের পর তিন মাসের মধ্যে পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করতে হবে।

২৬। রাষ্ট্রপ্রধান পার্লামেণ্টের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করবেন।

২৭। রাষ্ট্রপ্রধান সকল অর্থ সংক্রান্ত বিলে পার্লামেণ্ট থেকে প্রাপ্তির তিন দিনের মধ্যে সম্মতিদান করবেন। অন্য সকল বিলে সম্মতিদান করবেন ত্রিশ দিনের মধ্যে।

২৮। পার্লামেণ্ট দেশদ্রোহিতা ও অসদাচরণের অভিযোগে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নির্বাচনী কমিশনারকে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের ও পাকিস্তানের অডিটর জেনারেলকে অপসারণ করতে পারবে।

২৯। আইন পরিষদের সদস্যগণ সরকারের অধীনে লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না।

দ্রষ্টব্য : পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে প্রাপ্ত পারিশ্রমিক লাভজনক পদের আওতায় পড়বে না।

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার

৩০। পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হবেন।

৩১। রাষ্ট্রপ্রধানের পদে শূন্যতাসৃষ্টির ফলে স্পীকার রাষ্ট্র-প্রধানের কার্যভার গ্রহণ করলেও পার্লামেণ্টের সদস্যপদ থেকে বঞ্চিত হবেন না। তিনি যতদিন পর্যন্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান থাকবেন ততদিন তাঁর সদস্যপদ সাময়িকভাবে বাতিল অবস্থায় বজায় থাকবে।

পার্লামেণ্ট ভঙ্গকরণ

৩২। কোন গভীর গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্নে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনমত নির্ধারণের উদ্দেশ্যে মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্র-প্রধান পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দেবেন।

৩৩। যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজন কোন মন্ত্রিসভা গঠন করা যাচ্ছে না তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর ঐচ্ছিক ক্ষমতাবলে পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন অনু-ষ্ঠান করতে পারবেন।

৩৪। পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দেয়ার পর শূন্য আসনগুলি পূরণের জন্য ৪৫ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।

মন্ত্রিসভা

৩৫। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ যুক্তভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে পার্লামেণ্টের নিকট জবাবদিহি থাকবেন।

৩৬। পার্লামেণ্টের সদস্য নন এমন কোন নাগরিককে মন্ত্রী নিয়োগ করা যাবে, তবে এই শর্তে যে, মন্ত্রী নিযুক্ত হবার ছয় মাসের মধ্যে তাঁকে পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হতে হবে। এই ছয় মাসের মেয়াদ কোন ছলে বা কৌশলে বা আইনের হেঁয়ালি দিয়ে বর্ধিত করা যাবে না।

সুপ্রীম কোর্ট

৩৭। পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি সুপ্রীম কোর্ট থাকবে।

৩৮। সুপ্রীম কোর্টের অধিবেশন পর্যায়ক্রমে ফেডারেল রাজধানী ও পূর্বাঞ্চলের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হবে।

৩৯। সুপ্রীম কোর্টই হবে শাসনতন্ত্রের হেফাজতকারী।

৪০। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সকল নির্বাচনী বিরোধের জন্য সুপ্রীম কোর্টে একটি স্থায়ী নির্বাচন কমিটি গঠন করা হবে।

রাষ্ট্রভাষা

৪১। বাংলা ও উর্দু হবে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি রাষ্ট্রভাষা।

কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহ

৪২। বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা, এই শর্তে যে:

(ক) ফেডারেল রাজধানীতে অবস্থিত সুপ্রীম কমাণ্ডের অধীনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে আঞ্চলিক জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিংসহ প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের দুইটি ইউনিট গঠন করতে হবে।

(খ) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের নিয়েই আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চল থেকেই সে বাহিনীতে লোক সংগ্রহ করতে হবে।

(গ) পূর্ব পাকিস্তানে একটি আঞ্চলিক বৈদেশিক সম্পর্ক সংক্রান্ত দফতর স্থাপন করতে হবে।

(ঘ) অপর সকল ক্ষমতা অঞ্চলসমূহের হস্তে ন্যস্ত থাকবে।

পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব

৪৩। ফেডারেল সরকার কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় ও দ্রব্যের উপরই শুধু কর ধার্য করতে পারবেন। ঘাটতি পূরণের জন্য অঞ্চলসমূহের সম্মতি-ক্রমে নতুন বা অতিরিক্ত বিষয় সংযোজন করা যাবে।

শাসনতন্ত্রের সংশোধন

৪৪। সংবিধান হবে দেশের সর্বোচ্চ আইন।

৪৫। সংবিধানের যে অংশ ফেডারেল সরকার সম্পর্কিত বা ফেডারেল আইন সভাকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলী সংশ্লিষ্ট সে অংশ ফেডারেল আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সংশোধন করা যাবে; ফেডারেল ও কোন আঞ্চলিক সরকার বা সকল আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কে পরিবর্তন সাধনকারী কোন সংশোধনী গৃহীত

হবার একমাত্র পদ্ধতি হবে: সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পার্লামেণ্টে বা পার্লামেণ্টসমূহে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গৃহীত প্রস্তাবে বাঞ্ছিত সংশোধনের প্রস্তাব উণ্থাপন এবং অতঃপর ফেডারেল আইন পরিষদ কর্তৃক দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সেই প্রস্তাব গ্রহণ। সংবিধানের অন্য সকল প্রকার সংশোধনী আঞ্চলিক আইন পরিষদ দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গ্রহণ করতে পারবে।

শাসনতন্ত্র সাময়িকভাবে বাতিলকরণ

৪৬। শাসনতন্ত্র বা শাসনতন্ত্রের অংশবিশেষ সাময়িকভাবে বাতিল করার কোন ক্ষমতা কোন কর্তৃপক্ষকে দেয়া হবে না।

পরিশিষ্ট—ঝ

[১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রণ্টের ২১-দফা কর্মসূচী]

পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ্‌র মৌলিক নীতিনিচয়ের পরিপন্থী কোন আইন পার্লামেণ্টে গৃহীত হবে না এবং ইসলামের সাম্য ও সৌ-ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকদের জীবন যাপনের সৌকর্য বিধান করা হবে।

শাসনতন্ত্র ও মৌলিক অধিকারসমূহ

১। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুসারে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন আদায় করা হবে এবং প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রাব্যবস্থা কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে অন্য সকল বিষয় ইউনিট সরকারের অধীনে আনয়ন করা হবে। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে, সেনাবাহিনীর সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে ও নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে সামরিক দিক থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণ কারখানা (অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী) প্রতিষ্ঠা করা হবে। বর্তমান আনসার বাহিনীকে একটি পূর্ণাঙ্গ মিলিশিয়াতে রূপান্তরিত করে অস্ত্রসজ্জিত করা হবে।

২। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

৩। সকল নিরাপত্তা ও নিরোধমূলক আটক আইন বাতিল করা হবে এবং বিনাবিচারে আটক সকল বন্দীকে মুক্তি দেয়া হবে ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের উন্মুক্ত আদালতে বিচার করা হবে; সংবাদপত্র ও সভাসমিতি অনুষ্ঠানের অধিকার রক্ষা করা হবে; শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের পূর্ণ সুবিধা ও আন্তর্জাতিক

শ্রম সংস্থার চুক্তিসমূহ অনুসারে যৌথ দরকষাকষি করার জন্য আন্দো-লনের অবাধ অধিকার দেয়া হবে।

৪। বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা হবে।

৫। বিনা খেসারতে জমিদারী ও জমিতে সকল খাজনা ভোগী স্বার্থ বিলোপ করা হবে, উদ্বৃত জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে, এবং খাজনা হ্রাস করে ন্যায্য স্তরে নামিয়ে আনা হবে ও খাজনা আদায়ের সার্টিফিকেট প্রথা বিলোপ করা হবে।

৬। সমবায় কৃষি খামার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে এবং সরকারী সাহায্যদান করে খদ্দর ও অন্যান্য কুটির শিল্পের পূর্ণ বিকাশ সাধন করা হবে।

৭। কৃষি ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে দেশকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করা হবে।

৮। সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে এবং দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচানো হবে।

৯। পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ ক'রে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন করা হবে ও পাট উৎপাদকদের জন্য ন্যায্য মূল্য আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে এবং পাট নিয়ে মুসলিম লীগ আমলে যে ছিনিমিনি খেলা হয় তার তদন্ত ক'রে দায়ী ব্যক্তিদের দণ্ড দান করা হবে ও এই উপায়ে অর্জিত সকল সম্পত্তি বাজেয়াফত করা হবে।

১০। পূর্ব পাকিস্তানে কুটির শিল্প ও বৃহদায়তন শিল্প উভয় আকারেই লবণ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং মুসলিম লীগ আমলে লবণ সম্পর্কিত অব্যবস্থার বিষয় তদন্ত ক'রে অপরাধীদের শাস্তিদান ও এতদুপায়ে অর্জিত সকল সম্পত্তি বাজেয়াফত করা হবে।

১১। অবিলম্বে সকল মোহাজেরকে, বিশেষ ক'রে তাদের মধ্যে যারা কারিগর ও কুশলী কর্মী তাদের, পুনর্বাসন করা হবে।

১২। নিখরচায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা হবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

১৩। সরকারী ও বেসরকারী স্কুলসমূহের মধ্যেকার পার্থক্যের অবসান ক'রে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা হবে এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার প্রবর্তন করা হবে।

১৪। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত সকল প্রতিক্রিয়াশীল ও কালাকানুন বিলোপ করা হবে ; শিক্ষার ব্যয়বাহুল্য হ্রাস করা হবে, শিক্ষাকে জনসাধারণের কাছে আরো সহজলভ্য করে তোলা হবে এবং ছাত্রদের জন্য স্বল্প খরচে আবাসের ব্যবস্থা করা হবে।

১৫। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও উৎকোচ নির্মূল করা হবে এবং এই উদ্দেশ্যে সকল সরকারী কর্মচারী ও ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত অর্জিত সম্পত্তির হিসাব গ্রহণ করা হবে ; যে সম্পত্তি অর্জনের উপায় সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যাত হবে না সে-সম্পত্তি বাজেয়াফত করা হবে।

১৬। সর্বাত্মকভাবে প্রশাসন ব্যবস্থার ব্যয় হ্রাস করতে হবে এবং উচ্চ ও নিম্ন বেতনভুক সরকারী কর্মচারীদের বেতনের হার যৌক্তিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মন্ত্রিরা তাঁদের মাসিক বেতন ১,০০০ টাকার বেশী গ্রহণ করবেন না।

১৭। বর্ধমান হাউসকে আপাততঃ একটি ছাত্রাবাসে এবং পরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হবে।

১৮। বাংলা ভাষার জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারী যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের স্মৃতিকে অমর করার জন্য তাঁদের কবরের উপর একটি মিনার নির্মাণ করা হবে এবং তাঁদের শোক-সন্তপ্ত পরিজনকে ক্ষতিপূরণ দান করা হবে।

১৯। ২১শে ফেব্রুয়ারীকে 'শহীদ দিবস' ও সাধারণ ছুটির দিন বলে ঘোষণা করা হবে।

২০। পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রিসভা কোনক্রমেই আইন পরিষদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করবেন না এবং স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচনের সৌকর্য-বিধানের উদ্দেশ্যে সাধারণ নির্বাচনের ছয় মাস পূর্বে পদত্যাগ করবেন।

২১। আইন পরিষদের আসনসমূহের নৈমিত্তিক শূন্যতা অনুরূপ শূন্যতাসৃষ্টির তিনমাসের মধ্যে উপনির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হবে এবং পর পর তিনটি উপ-নির্বাচনে মন্ত্রিসভার মনোনীত প্রার্থীরা পরাজিত হলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন।

পরিশিষ্ট—এঃ

আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী

দফা—১

শাসনতন্ত্রে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সত্যিকার অর্থে একটি পাকিস্তান ফেডারেশন এবং সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত আইন পরিষদের প্রাধান্যসহ পার্লামেণ্টারী ধরণের সরকার গঠনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

দফা—২

ফেডারেল সরকারের হাতে প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক, মাত্র এই দুইটি বিষয় থাকবে, এবং অবশিষ্ট অন্য সকল বিষয় ফেডারেশনে যোগদানকারী রাষ্ট্রসমূহের উপর ন্যস্ত থাকবে।

দফা—৩

ক। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি পৃথক, তবে পরস্পরের মধ্যে অবাধে রূপান্তরযোগ্য মুদ্রাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে, কিংবা

খ। সারাদেশে একটি মাত্র মুদ্রাব্যবস্থাই চালু থাকতে পারে। তবে সে-ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পুঁজি পাচারের বিরুদ্ধে কার্যকরী শাসনতান্ত্রিক বিধান থাকতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাঙ্কিং রিজার্ভ এবং পৃথক আর্থিক ও মুদ্রানীতি গ্রহণ করতে হবে।

দফা—৪

করধার্যকরণ ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ফেডারেশনে অংশ গ্রহণকারী ইউনিটসমূহে ন্যস্ত থাকবে; ফেডারেল কেন্দ্রের অনুরূপ কোন

ক্ষমতা থাকবে না। ফেডারেশন প্রয়োজনীয় ব্যয়নির্বাহের জন্য রাষ্ট্রের আদায়ীকৃত করের অংশ লাভ করবেন। নির্দিষ্ট শতকরা হারে সকল রাষ্ট্রীয় করের অংশ সমন্বয়ে সম্মিলিত কেন্দ্রীয় তহবিল (কনসলিডেটেড ফেডারেল ফাণ্ড) গঠন করা হবে।

দফা—৫

(১) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্পর্কে পৃথকভাবে হিসাবপত্র (দুইটি পৃথক এ্যাকাউণ্ট) রাখা হবে।

(২) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

(৩) ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল থেকে সমান হারে কিংবা নির্ধারিতব্য অনুপাতে সংস্থান করা হবে।

(৪) দেশী পণ্য বিনাশুল্কে দুই অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াত করবে।

(৫) শাসনতন্ত্রে ইউনিট সরকারসমূহকে বৈদেশিক রাষ্ট্রের সংগে ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপন ও বিদেশী রাষ্ট্রের সংগে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দেয়া হবে।

দফা—৬

পূর্ব পাকিস্তানে একটি সামরিক বা সামরিক প্রতীম (মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারী) বাহিনী গঠন করা হবে।



পরিশিষ্ট—ট

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন

(পি, ডি, এম)-এর ৮ দফা কর্মসূচী

১। শাসনতন্ত্রে পার্লামেণ্টারী ধরণের সরকারসহ পাকিস্তানে একটি ফেডারেশন গঠন, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত আইন পরিষদের সর্বোচচ ক্ষমতা, পূর্ণাঙ্গরূপে সকল মৌলিক অধিকার, সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতা ও বিচার বিভাগের নিশ্চিত স্বাধীনতার বিধান করা হবে।

২। ফেডারেল সরকারের আওতায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকবে: (১) প্রতিরক্ষা, (২) বৈদেশিক সম্পর্ক, (৩) মুদ্রাব্যবস্থা ও ফেডারেল অর্থ, (৪) আন্তঃআঞ্চলিক যোগাযোগ ও বাণিজ্য এবং সর্বসম্মত অন্যান্য বিষয়।

৩। পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠা করা হবে, এবং অবশিষ্ট সকল বিষয় সংক্রান্ত ক্ষমতা উভয় অঞ্চলে শাসনতন্ত্র মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত সরকারে ন্যস্ত হবে।

৪। পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হবে দশ বছরের মধ্যে উভয় অঞ্চলের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার যে অংশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং বিদেশ থেকে প্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য ঋণ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় দায়ভাগসহ কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রাব্যয়ের আনুপাতিক অংশ হিসাবে ব্যয়িত হবে সে অংশ ছাড়া অবশিষ্ট সমগ্র অংশ উক্ত দশ বছর শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই ব্যয়িত হবে। প্রদেশসমূহের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ণতঃ প্রাদেশিক সরকারসমূহের এখতিয়ারাধীন থাকবে। পাকিস্তান সরকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্য

ও ঋণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে অগ্রাধিকার দান করবেন এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে পুঁজি অপসারণ রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও মুদ্রানীতি অবলম্বন করবেন। এই উদ্দেশ্যে, বিশেষতঃ ব্যাঙ্ক পুঁজি ও মুনাফা, বীমার প্রিমিয়াম ও শিল্পে অর্জিত মুনাফা সম্পর্কে সময়ে সময়ে যথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা হবে।

৫। (১) মুদ্রানীতি, বৈদেশিক মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং;
(২) আন্তঃ আঞ্চলিক বাণিজ্য,
(৩) আন্তঃ আঞ্চলিক যোগাযোগ ও
(৪) বৈদেশিক বাণিজ্য

—জাতীয় পরিষদের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের দ্বারা যথাক্রমে নির্বাচিত উভয় অঞ্চলের সমান সংখ্যক সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বোর্ড এই বিষয়গুলির প্রত্যেকটি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিযুক্ত হবে।

৬। সুপ্রীম কোর্ট এবং কূটনৈতিক বিভাগ ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাবলীসহ সকল কেন্দ্রীয় চাকুরীতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সমান সংখ্যক লোক নিযুক্ত হবে। অনুরূপ সংখ্যা-সাম্যে উপনীত হবার উদ্দেশ্যে, ভবিষ্যতের বিনিয়োগ নীতি এমন পদ্ধতিতে নির্ধারিত হবে যে, দশ বছরের মধ্যে অনুরূপ কর্মচারীর মোট সংখ্যা পরস্পরের সমান হবে।

৭। দেশের উভয় অঞ্চলের প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের কার্যকরী যুদ্ধ ও আক্রমণ শক্তির সমতাবিধান এবং তদুদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে একটি সামরিক একাডেমী, অস্ত্রনির্মাণ কারখানাদি ও ক্যাডেট কলেজ ও স্কুল স্থাপন, পূর্ব পাকিস্তান থেকে তিনটি বাহিনীতেই লোকসংগ্রহ করা ও নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করা, পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হবে। এই সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে

সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি প্রতিরক্ষা পরিষদ (ডিফেন্স কাউন্সিল) গঠন করতে হবে।

৮। এই ঘোষণায় উল্লিখিত "শাসনতন্ত্র" মানে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র, যা' অচিরেই ঘোষণা করা হবে। শাসনতন্ত্র ঘোষণার ছয় মাসের মধ্যেই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠান করা হবে এবং জাতীয় পার্লামেণ্টকে সবার আগে উপরিউক্ত ২য় থেকে ৭ম অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরিবর্তনসমূহ শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সকল অঙ্গ দল ও প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে এই লক্ষ্যের পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবেন।

পরিশিষ্ট—ঠ

[পাকিস্তান গণতান্ত্রিক দলসমূহ-সমবায় (পি, ডি, পি)-এ ১৯৬৯ সালের ২৭ ও ২৮শে সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত কনভেনশনে গৃহীত শাসনতান্ত্রিক কর্মসূচী।]

দেশে গণতন্ত্রের ত্বরিৎ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পি,ডি,পি নিম্নোক্ত পরিবর্তনসমূহ সাপেক্ষে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পক্ষপাতী ঃ

(ক) ফেডারেল সরকারের আওতায় থাকবে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, মুদ্রা ব্যবস্থা, ফেডারেল অর্থ, আন্তঃ আঞ্চলিক ও বহির্দেশীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাণিজ্য এবং সর্বসম্মত অন্যান্য বিষয়।

(খ) পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বরে বিদ্যমান প্রদেশগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে। বেলুচিস্তান পূর্ণ প্রাদেশিক মর্যাদা লাভ করবে। কোন প্রদেশের সংলগ্ন উপজাতীয় এলাকা সেই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং করাচী পুনরায় সিন্ধুর অন্তর্ভুক্ত হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলির সমবায়ে একটি আঞ্চলিক ফেডারেশন গঠন করা হবে ; এই ফেডারেশনের একটি মাত্র আইন পরিষদ থাকবে এবং আইন পরিষদে পাঞ্জাব শতকরা ৫০টির অধিক আসনের অধিকারী হবে না। পুনর্গঠিত প্রদেশগুলি পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে তাদের সাবেক ক্ষমতাগুলি পুনরায় লাভ করবে। বেলুচিস্তান ও বাহওয়ালপুর অন্যান্য প্রদেশের মতোই ক্ষমতাবলীর অধিকারী হবে।

(গ) ফেডারেল আইন পরিষদ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হবে ; এক কক্ষ জনগণের পরিষদ ও অপরটি ইউনিট সমূহের পরিষদ। জনগণের পরিষদ জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবে। ইউনিট সমূহের পরিষদ ইউনিট পরিষদসমূহ দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবে এবং এই পরিষদে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যা-সাম্য বজায় রাখা হবে।

(ঘ) পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত করা হবে এবং অবশিষ্ট ক্ষমতাবলী প্রদেশসমূহে ন্যস্ত হবে।

(ঙ) মুদ্রাব্যবস্থা, বৈদেশিক মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং; আন্তঃ আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ; বৈদেশিক বাণিজ্য এই বিষয়গুলির প্রত্যেকটির ব্যবস্থাপনার জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করা হবে।

(চ) পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হবে দশ বছরের মধ্যে উভয় অঞ্চলের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার যে অংশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং বিদেশ থেকে প্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য ঋণসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় দায়ভাগসহ কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রাব্যয়ের আনুপাতিক অংশ হিসেবে ব্যয়িত হবে সে অংশ ছাড়া অবশিষ্ট সমগ্র অংশ উক্ত দশ বছর শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই ব্যয়িত হবে। অঞ্চলসমূহের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঞ্চলসমূহের এখতিয়ারাধীন থাকবে। পাকিস্তান সরকার বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণবরাদ্দের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে অগ্রাধিকার দান করবেন এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে পুঁজি অপসারণ রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও মুদ্রানীতি অবলম্বন করবেন। এই উদ্দেশ্যে, বিশেষতঃ ব্যাঙ্ক, পুঁজি, মুনাফা ও শিল্প আয় সম্পর্কে সময়ে সময়ে যথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা হবে।

(ছ) দেশের সকল প্রতিরক্ষা বাহিনীতে উভয় অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বের সমতাবিধান করা এবং তদুদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে একটি মিলিটারী একাডেমী, অস্ত্র নির্মাণ কারখানাদি, ক্যাডেট কলেজ ও স্কুল ও নৌ বাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করা পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হবে। এই সকল উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নকল্পে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি প্রতিরক্ষা পরিষদ (ডিফেন্স কাউন্সিল) গঠন করা হবে।

(জ) প্রধান বিচারপতির পদ ব্যতীত, সুপ্রীম কোর্টে এবং কূটনৈতিক বিভাগ ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাবলীসহ সকল কেন্দ্রীয় চাকুরিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সমান সংখ্যক লোক নিযুক্ত করা হবে।

শেষ